কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান

ডা. জাকির নায়েক

ভাষান্তর :
খোন্দকার হাবীবুর রহমান

কুরআন
এবং
আধুনিক বিজ্ঞান

মূল : ডা. জাকির নায়েক

ভাষান্তর
খোন্দকার হাবীবুর রহমান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান

ডা. জাকির নায়েক

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক প্রকাশনা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩, মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০২

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৫

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আল মুজাহিদী

ডিজাইন : মোঃ আব্দুল লতিফ

মূল্য ঃ ১৭০.০০

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল- ০১৭১১-৮১৬০০১

১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

QURAN ABONG ADHUNIK BIGGAN Written by–Dr. Jakir Nayek, Published by: S.M. Raisuddin, Director, Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk.170/- US $: 5.00 **ISBN. 984-70241-0077-1**

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় মাতামহ মরহুম সৈয়দ আতোয়ার রহমান
স্নেহময়ী মাতামহী মরহুম সৈয়দা মাহমুদা খাতুন
কোমলপ্রাণ পিতা মরহুম খোন্দকার হামিদুর রহমান
প্রাণপ্রিয় মাতা সৈয়দা আকলিমা খাতুনের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহীয়ান সত্তার, যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। যিনি করুণা, দয়া ও ক্ষমার আধার এবং যার কাছে আমাদের অনিবার্য প্রত্যাবর্তন। দরূদ ও সালাম রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, শান্তি ও কল্যাণের যে মহান দূত আমাদের নাযাতের ভরসা।

একবিংশ শতাব্দীর এই সূচনালগ্নে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের চোখে যখন শান্তি ও উন্নত জীবনের স্বপ্ন, সেই শুভ মুহূর্তেও অমঙ্গল ও অশান্তির দূতেরা শান্তির ধর্ম ইসলামের আদর্শকে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করছে এবং সন্ত্রাস ও ইসলামকে সমার্থক করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

এই পরিস্থিতির পটভূমিতে ডা. জাকির নায়েক শান্তি ও সাম্যের ধর্ম ইসলামের পক্ষে এক বলিষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য ইসলামই যে আল্লাহ সুবহানাহুতা'য়ালার মনোনীত চূড়ান্ত ধর্ম, আল-কুরআনই যে মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনন্ত উৎস এবং মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (Complete code of life) ডা. জাকির নায়েক সেই সত্যকে অনবদ্যভাবে তুলে ধরে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন এবং এই মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। এছাড়া তিনি যুক্তিনির্ভর তথ্য উপাত্ত দিয়ে প্রমাণ করেছেন বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার এই বিপুল উন্নতির যুগে বিজ্ঞানীরা যে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করছেন, তার অধিকাংশই এখন থেকে ১৪০০ বৎসর পূর্বে নাযেল হওয়া কুরআনুল কারিমে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূল হিসেবে যে Big Bang Theory মহাকাশ

বিজ্ঞানীরা এখন তুলে ধরেছেন সেই তথ্য আল্লাহ্ সুদূর প্রাচীনকালেই নাবিয়িল উম্মি (নিরক্ষর নবী) হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর কাছে অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছিলেন এবং তা কুরআনুল কারীমে বিধৃত রয়েছে।

ডা. জাকির নায়েক আজকের অস্থির সময়ে ইসলামের শান্তি ও সাম্যের দীপবর্তিকার উজ্জ্বল আলো বিশ্বময় ছড়িয়ে সৃষ্টি করছেন অনন্ত কল্যাণের এক পবিত্র আবহ।

(ক) ডা. জাকির নায়েকের মহামূল্যবান পুস্তিকাটি বাংলায় ভাষান্তর করার জন্য অনুপ্রেরণা পেয়েছি কল্যাণের দূত আলহাজ মুজিবুল হায়দার চৌধুরী ও বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ডা. মুহম্মদ আনিসুল হক, বাংলার বুলবুল মরহুম আব্বাস উদ্দিন আহমেদের সুযোগ্য সন্তান আধ্যাত্মিক সাধক মুস্তাফা জামান আব্বাসী (রঃ), ড. মিজানুর রহমান মিজান, লেখক ডা. এম, এ হাদী, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ এরতাজ আলম, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেটের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আবদুল হান্নান জোয়ারদার, বাংলাদেশ সরকারের সিনিয়র ডেপুটি সেক্রেটারী বহুগুণের অধিকারী নুজহাত ইয়াসমিন, বিদূষী মীর্জা তাবাস্সুম ইয়াসমিন, দূস্থজনের পরম বন্ধু লায়ন মোসলেহ্ উদ্দিন আহমেদ, পরিশুদ্ধ পথের অভিযাত্রী মোঃ সারওয়ার আলম কাজল এবং আল্লাহ্র নেকবান্দা তাওহিদা খানমের কাছ থেকে। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পুস্তকটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশে উৎসাহ এবং সক্রিয় সহযোগিতা দিয়ে আমাকে গভীর ঋণে আবদ্ধ করেছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় কবি শিহাম আল মুজাহিদী।

বাংলায় ভাষান্তরিত পাণ্ডুলিপি পরিমার্জন ও পরিশোধনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন সুলতানা শাহলিনা ফেরদৌসী শম্পা, সৈয়দ ফজলে মুনীম ও মরিয়াম আক্তার লীনা। এ ছাড়া সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আমার জীবন সাথী বিলকিস সুলতানা। আল্লাহ্ তাদের পরিশ্রম কবুল করুন।

(খ) Quran and Modern Science : Compatible or Incompatible পুস্তিকার বাংলা সংস্করণটি বাংলাভাষী জনগণকে আরো বেশী উদ্বুদ্ধ করুক, শান্তিধারায় স্নাত হোক এ সময় ও এই সমাজ, রাব্বুল আলামিনের করুনার দরবারে এই প্রার্থনা।

খোন্দকার হাবীবুর রহমান

প্রকাশকের কথা

ডা. জাকির নায়েক সমসাময়িক দুনিয়ার একজন প্রভাবশালী ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি তার চিন্তার জগতকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিস্তারিত করেছেন পাণ্ডিত্যের আধারে এবং বাগ্মিতার বিপুল সম্ভারে। তার "দ্য কুরআন এণ্ড সাইন্স" বিশ্বের বহু দেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পাঠক সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক খোরাকের প্রয়োজনে আমরা এটির অনুবাদ প্রকাশনার কাজে হাত দিই। বইটির অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক খোন্দকার হাবীবুর রহমান। অনুবাদের স্বচ্ছতার জন্য আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এর এই প্রকাশনা—বাংলাদেশের সাহিত্যিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক পরিমণ্ডলে মহাগ্রন্থ আল কোরআনেরই বিস্ময়কর আলোকচ্ছটার বিচ্ছুরণ ঘটাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আল্লাহ আমাদের এই বিনীত প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য

পৃথিবী নামক এই গ্রহে মানব জীবনের উন্মেষকাল থেকেই মানুষ একদিকে যেমন প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করেছে তেমনি অপর দিকে জানতে চেষ্টা করেছে সৃষ্টির অপার রহস্যভরা অনন্ত ব্যাপ্তিতে নিজ অবস্থানের সঠিক পরিচিতি। তা ছাড়াও অন্বেষণ ছিল জীবন রহস্যের আবরণ উন্মোচনের। জীবন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য কী? কোথায় এর শুরু, কোথায় শেষ? বহু শতাব্দী ও সভ্যতার বিশাল পরিধিতে মানুষের নিরন্তর অন্বেষার ফলশ্রুতিতেই এসেছে ধর্মীয় চেতনাবিধৃত জীবনাচরণ। ঐ সংগঠিত আচরণ বা রীতিবদ্ধতাই মানুষের জীবনযাত্রাকে দিয়েছে নির্দিষ্ট কাঠামো এবং নিয়ন্ত্রণ করছে ইতিহাসের গতিধারা। মানুষের অনুসৃত কোন কোন ধর্মের ভিত্তি ছিল এমন গ্রন্থ, যাকে ঐ সব ধর্মের অনুসারীরা ঐশী গ্রন্থ বলে দাবি করেন। অন্যান্য

কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসন গড়ে উঠেছে মানবিক অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে।

ইসলামি জীবনাদর্শের মূলে রয়েছে মহা গ্রন্থ আল কুরআন। মুসলিম সম্প্রদায় আল কুরআনকে সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর নাজিলকৃত ঐশী গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করেন। মুসলমানরা আরো বিশ্বাস করেন আল কুরআন সমগ্র মানবতার জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যেহেতু আল কুরআনের বাণীকে সর্বকালীন (শাশ্বত) বলে মনে করা হয়, সেহেতু আল কুরআনের বাণী প্রতিটি সময়কালের জন্যই প্রযোজ্য। আল কুরআন সম্পর্কিত উক্ত বিশ্বাস কি সঠিক হিসেবে প্রমাণিত? এই পুস্তিকায় আমি সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের প্রেক্ষিতে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে আল কুরআন সম্পর্কিত মুসলিম আকিদা বা বিশ্বাসের নির্ভুলত্বের বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন একটা সময় ছিল যখন অলৌকিক ঘটনা বা অলৌকিক বলে মনে হয় এরূপ বিষয়কে মানবিক যুক্তিগ্রাহ্য বাস্তবতার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হতো। কিন্তু যুক্তির ভিত্তিতে আমরা "অলৌকিক" শব্দের কি ব্যাখ্যা দিতে পারি? অলৌকিক তাকেই বলা যায় জীবন ও জগতের স্বাভাবিক ঘটনাবলীর মধ্যে যা পড়ে না এবং মানুষের পক্ষে যুক্তি দিয়ে যা বোঝানো সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে কোন বিষয়কে 'অলৌকিক' বলে স্বীকৃতি দিতে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ১৯৯৩ সালে ভারতের মুম্বাইয়ের টাইমস্ অব ইন্ডিয়া পত্রিকার এক খবরে বলা হয় : বাবা পাইলট নামের এক মুনি

পানির ট্যাংকের ভিতরে তিন দিন তিন রাত ডুবন্ত অবস্থায় কাটিয়েছেন। উৎসুক সাংবাদিকরা যখন ঐ ট্যাংকের তলা পরীক্ষা করে দেখতে চান তখন বাবা পাইলট তাদের বাধা দেন এবং পাল্টা প্রশ্ন করেন সন্তান ধারণকারিণী মাতার গর্ভাশয় কি পরীক্ষা করা যায়? এই ঘটনা স্পষ্ট প্রমাণ করে বাবা পাইলট কিছু লুকাতে চাচ্ছিলেন। আসলে 'মুনি' হিসেবে নিজের প্রচারের জন্য এটা ছিল তার নিছক ধাপ্পাবাজি। সামান্যতম বাস্তবতাবোধ সম্পন্ন কোনো আধুনিক মানুষের কাছে এরূপ ধাপ্পাবাজিকে 'অলৌকিক' হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এ ধরনের ভুয়া অলৌকিকতাকে যদি সত্য বলে গ্রহণ করা হয়, তাহলে বিশ্বখ্যাত যাদুকর পি সি সরকার, যিনি অবিশ্বাস্য সব যাদুর খেলা দেখাতেন এবং অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাতে পারতেন, তাকেও ঐশী ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে মেনে নিতে হয়।

কোনো গ্রন্থের উৎসকে ঐশী বলে দাবি করার অর্থ হচ্ছে তাকে 'অলৌকিক' হিসেবে মেনে নেওয়ার দাবি। যেকোনো সময়েই তৎকালীন মান অনুযায়ী ঐ দাবির যথার্থতা সহজেই যাচাই করা সম্ভব। বিশ্ব মুসলিমের দৃঢ় বিশ্বাস আল কুরআন আল্লাহর নাজিলকৃত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ঐশী গ্রন্থ, যা অলৌকিকতার চেয়ে 'অলৌকিক' এবং মানবতার জন্য আল্লাহর দয়া ও করুণার দান। আমরা এখানে মুসলমানদের ঐ বিশ্বাসের সত্যতা পরীক্ষার চেষ্টা করব।

জাকির নায়েক

আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ

সকল সংস্কৃতিতেই সাহিত্য ও কাব্য মানবিক সৃজনশীলতা ও ভাব প্রকাশের মাধ্যমে হিসেবে পরিগণিত। ইতিহাসের এক সুদীর্ঘ পর্যায় জুড়ে সাহিত্য ও কাব্যকে উচ্চ মর্যাদা ও গৌরবের আসন দেওয়া হতো। আজকের দিনে যেমন দেওয়া হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাকে।

মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করেন আল কুরআন আরবি সাহিত্যের সর্বোত্তম নিদর্শন এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আরবি সাহিত্য। এই অবিনশ্বর সত্য সম্বন্ধে আল কুরআনে অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এভাবে :-

"আমার বান্দার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে, সে সম্পর্কে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে তবে অনুরূপ (অন্তত) একটি সূরা তৈরি করে উপস্থাপন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সাক্ষীদের ডাক, যদি তোমাদের সন্দেহ সত্য হয়ে থাকে! যদি তা না পার এবং কখনই তা পারবে না- তবে সেই অগ্নিকে ভয় কর- যা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের

জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে, মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন।" *(আল কুরআন ২:২৩-২৪)*

দ্রষ্টব্য : এই পুস্তিকার সর্বত্র আল কুরআন থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি (নিম্নে উল্লেখিত) অবলম্বন করা হয়েছে। সূত্র ও অনুবাদ নেওয়া হয়েছে মেরিল্যান্ড, ইউএস এ থেকে আমানা কর্পোরেশন কর্তৃক ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী অনূদিত আল কুরআন-এর সংশোধিত নতুন সংস্করণ থেকে।

পদ্ধতি : আল কুরআন ২ : ২৩-২৪ অর্থাৎ ২ নং সূরার ২৩ ও ২৪ নং আয়াত।

অবিশ্বাসীদের প্রতি আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে: তোমরা আল কুরআনে বিধৃত সূরাসমূহের অনুরূপ অন্তত একটি সূরা তৈরি করে দেখাও। এই চ্যালেঞ্জ আল কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ১৪০০ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে আজ পর্যন্ত আল কুরআনের সূরাসমূহের কোনো একটির মতও সৌন্দর্য, নিশ্চয়তা, ভাবগভীরতা ও আলংকারিক শব্দচয়ন সম্বলিত কোন সূরা তৈরি করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে কোন ধর্মীয় গ্রন্থে যত কাব্যিক মধুরতা নিয়েই বলা হোক না কেন যে পৃথিবী 'চ্যাপ্টা'- একজন যুক্তিও বাস্তববাদী মানুষের কাছে তা কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ এখন আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন প্রজ্ঞা, যুক্তি ও বাস্তবতা সম্পৃক্ত বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই আল কুরআনের অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত ভাষাশৈলী এর স্বর্গীয় উৎসের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য

হবে না। কোন ধর্মগ্রন্থকে ঐশী হিসেবে দাবি করতে হলে উক্ত গ্রন্থের যুক্তি গ্রাহ্যতার শক্তিকে ভিত্তি করেই করতে হবে।

বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের (Albert Einstein) অভিমত হচ্ছে "ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান হচ্ছে খোঁড়া এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম একেবারেই অন্ধ"। কাজেই আসুন আমরা কুরআনের বাণী সম্পর্কে অবহিত হই এবং বিশ্লেষণ করে দেখি, এই পবিত্র গ্রন্থ আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি সামঞ্জস্যহীন?

আল কুরআন কোন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়। এটি সংকেত বা আয়াতসম্বলিত একটি গ্রন্থ। আল কুরআনে ছয় সহস্রাধিক আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে এক হাজারের বেশি আয়াত বিজ্ঞান সম্পৃক্ত। আমরা জানি, কখনো কখনো বিজ্ঞান হঠাৎ করেই উল্টোপথ ধরে (Uturn)। এই পুস্তিকায় আমি শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোকেই বিবেচনায় নিয়েছি। প্রামাণ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন ধারণা বা তথ্যকে আমলে নেওয়া হয়নি।

জ্যোতির্বিদ্যা

নভোমণ্ডল সৃষ্টি : মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) তত্ত্ব

মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানীদের যে মতবাদটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে সেটা হচ্ছে, মহাবিস্ফোরণ বা Big bang theory। এই Theory বা তত্ত্ব বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের যুগ যুগ ধরে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান ও গবেষণার ফল। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সৃষ্টির আদিতে মহাবিশ্ব, গ্রহ, নক্ষত্রপুঞ্জ ছিল একটি একক বস্তুর (Primary Nebula) আকারে। অতঃপর ঘটল এক মহাবিস্ফোরণ (Big bang), Primary Nebula অজস্র খন্ডে বিভক্ত হয়ে গেল এবং সৃষ্টি হলো ছায়াপথ মণ্ডলী। আবার এই সব ছায়াপথ বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হলো নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্রহ, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি। মহাবিশ্ব সৃষ্টি ছিল এক অনন্য ও সুপরিকল্পিত ঘটনা। কাজেই এই সৃষ্টি আকস্মিকভাবে ঘটেছে এমন সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নেই। মহাবিশ সৃষ্টি সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে:

"অবিশ্বাসীরা কি দেখে না আমরা বিচ্ছিন্ন করার আগে আকাশ ও পৃথিবী একাকার হয়ে মিশেছিল (একক সৃষ্টি রূপে)?" *(আল কুরআন ২০:৩০)*

আধুনিক বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত মহাবিস্ফোরণ (Big bang) তত্ত্ব এবং আল কুরআনের বাণীর এই আশ্চর্য সাযুজ্য সত্যিই বিস্ময়কর। ১৪০০ বৎসর পূর্বে আরবের মরুভূমিতে যে গ্রন্থের প্রথম আবির্ভাব, সেই গ্রন্থে কিভাবে উচ্চারিত হলো বহু শতাব্দী পরে আবিষ্কৃত এই বিপুল গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য?

ছায়াপথ সৃষ্টির পূর্বে অনন্ত শূন্য ছিল এক বিশাল গ্যাসীয় পিণ্ড

বিজ্ঞানীদের ধারণা মহাশূন্যে ছায়াপথ সৃষ্টির পূর্বে মহাজাগতিক বস্তুগুলো ছিল এক বিশাল গ্যাসীয় ক্ষেত্র আকারে। সংক্ষেপে বলা যায়, ছায়াপথের আবির্ভাবের পূর্বে মহাশূন্য ছিল গ্যাসীয় ক্ষেত্র বা মেঘ। নভোমণ্ডলের আদি উৎস সম্পর্কিত আলোচনায় ধোঁয়া শব্দটি গ্যাসের চেয়ে অধিকতর প্রযোজ্য। আল কুরআনের নিম্নে উল্লেখিত ভাষ্যে মহাশূন্যের আদি অবস্থা বর্ণনায় 'দুখান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ ধোঁয়া:

"অনন্তর তিনি মহাকাশের দিকে দৃষ্টি দেন, যা ছিল ধূম্রাকার, তিনি ধূম্রাকার বস্তুকে এবং পৃথিবীকে নির্দেশ দিলেন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক তোমরা একত্রিত হয়ে এসো। তারা আরজ করল, আমরা (তোমার) একান্ত অনুগত হিসেবে উপস্থিত (একীভূত হয়ে)।" *(আল কুরআন ৪০:১১)*

আল কুরআনের ভাষ্য Big bang তত্ত্বের সাথে একান্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরবর্তীকালে দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আবিস্কৃত এই

তথ্য মহানবী মুহাম্মদের (সা:) সময়কালীন আরব ভূখণ্ডে সম্পূর্ণ অজানা ছিল। প্রশ্ন আসে, তাহলে আল কুরআনে উল্লেখিত এই জ্ঞানের উৎস কী?

পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার

পূর্বকালে মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবীর আকার চ্যাপ্টা (flat)। শত শত শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ তাদের বাসভূমি থেকে দূরে যেতে ভয় পেতো, যদি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে নিচে পড়ে যায়? ১৫৯৭ সালে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক (Sir Francis Drake) জাহাজে করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসে প্রমাণ করেন পৃথিবী গোলাকার। এই প্রসংগে আল কুরআনের ভাষ্য :

"তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতের সাথে মিশিয়ে দেন?" *(আল কুরআন ৩১:২৯)*

এখানে মিশে যাওয়া কথাটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে রাত্রি ধীরে ধীরে এবং ক্রমশ: দিনে পরিবর্তিত হয়। অন্যদিকে দিন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় রাত্রিতে। পৃথিবীর আকার গোলাকৃতি হলেই শুধুমাত্র এ ধরনের পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে। যদি পৃথিবী চ্যাপ্টা (flat) হতো তাহলে দিন রাত্রির পরিবর্তন হতো তাৎক্ষণিক। অর্থাৎ দিন দেখা দিত এবং হঠাৎ রাত্রি নামত।

আল কুরআনের অন্য একটি ভাষ্যে পৃথিবীর আকৃতি যে গোলাকার তারই ইঙ্গিত রয়েছে :

"তিনি (যথার্থ) আনুপাতিকভাবে নভোমণ্ডলি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিনকে আবরিত করেন, এবং রাত্রিকে আবরিত করেন দিন দ্বারা।" *(আল কুরআন ৩৯:৫)*

'কাওয়ারা' নামক যে আরবি শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ আংশিকভাবে আবরিত করা বা পেঁচানো (coiled) যেমন ভাবে মাথার পাগড়ি পেঁচানো হয়। দিন ও রাত্রির এই আংশিক আবৃতকরণ বা পেঁচানো সম্ভব হতো না, যদি পৃথিবী গোলাকার না হতো।

পৃথিবী গোলাকৃতি একথা ঠিক। কিন্তু একেবারে একটি গোলাকার বস্তু বা বল-এর মতো গোল নয়। গ্রহটি প্রকৃতপক্ষে ডিম্বাকার। উত্তরে দক্ষিণে ঈষৎ চাপা। অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে রয়েছে কিছুটা সমতল (flat) ক্ষেত্র। এ সম্পর্কে আল কুরআনের আয়াতঃঃ

"এবং অতঃপর, তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন ডিম্বাকৃতিতে।" *(আল কুরআন ৭৯:৩০)*

ডিম্বের আরবি প্রতিশব্দ হিসেবে এই আয়াতে 'ডাহাহা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'ডাহাহা' বলতে অস্ট্রিচের ডিমও বোঝায়। অস্ট্রিচের ডিমের আকারের সাথে পৃথিবীর আকারের সাদৃশ্য রয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে আল কুরআনে সেই সময়ে পৃথিবীর আকৃতির সার্বিক ও বাস্তব বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যখন সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা ছিল পৃথিবী চ্যাপ্টা (flat)।

আল্লামা ইউসুফ আলী 'ডাহাহা' -এর অনুবাদ করেছেন 'বিশাল বিস্তৃতি'। এই অনুবাদও সঠিক। তবে 'ডাহাহা' বলতে অস্ট্রিচের ডিমও বোঝায়।

চাঁদের আলো প্রকৃতপক্ষে প্রতিফলিত আলো

প্রাচীনকালে মানুষ বিশ্বাস করত চাঁদের আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয় চাঁদ থেকেই। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান সে ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে চাঁদের আলো প্রকৃতপক্ষে প্রতিফলিত আলো। আশ্চর্যের বিষয় বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান যা বলছে, ১৪০০ বৎসর পূর্বেই সে তথ্য আল কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াত অবধান করা যেতে পারে :

"কত মহান তিনি, যিনি মহাশূন্যে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন এবং স্থাপন করেছেন এক প্রদীপ এবং চন্দ্র, যা তার মাধ্যমে আলো ছড়ায়।" *(আল কুরআন ২৫: ৬১)*

আল কুরআনে সূর্যের আরবি নাম 'শামস্'। শামস্কে কখনো বলা হয়েছে সিরাজ বা টর্চ। আবার কখনো 'ওয়াহ হাজ' বা উজ্জ্বল প্রদীপ। আবার কখনো বলা হয়েছে 'দিয়া'। 'দিয়া' অর্থ মহিমান্বিত দীপ্তি।

তিনটি বিশ্লেষণই সূর্যের জন্য প্রযোজ্য। কারণ সূর্য তার অভ্যন্তরীণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে ধারণাতীত উত্তাপ ও আলোকরশ্মি সৃষ্টি করে। চাঁদকে আরবিতে ‘কামার’ বলা হয়। কুরআনুল কারিমে চাঁদ বর্ণিত হয়েছে “মুনির” নামে। মুনির হচ্ছে এমন একটি বস্তু পিণ্ড, যা নূর বা আলো দেয়। উল্লেযোগ্য যে কুরআনের বর্ণনা চাঁদের প্রকৃতির সাথে একান্তভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ চাঁদ নিজ থেকে উৎসারিত আলো ছড়ায় না, চাঁদের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় সূর্যের আলো। আল কুরআনে একবারও চাঁদকে ‘সিরাজ’ ‘ওয়াহহাজ’ অথবা ‘দিয়া’ নামে অভিহিত করা হয়নি। পক্ষান্তরে সূর্যকেও কখনও নূর অথবা মুনীর নামে অভিহিত করা হয়নি। এতে বোঝা যায়, কুরআনুল কারিমে সূর্য ও চাঁদের পৃথক প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সূর্য ও চাঁদের প্রকৃতি সম্পর্কে আল কুরআনের আরও দু’টি আয়াত বিবেচনা করা যেতে পারে :

“তিনিই সূর্যকে তেজস্কর এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় (সুন্দর) করে সৃষ্টি করেছেন।” *(আল কুরআন ১০: ৫)*

অন্যত্র :

“তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলো রূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন (প্রোজ্জ্বল) প্রদীপ রূপে?” *(আল কুরআন ৭১: ১৫-১৬)*

সূর্য আবর্তনশীল

সুদীর্ঘকাল ইউরোপীয় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল পৃথিবী এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে স্থির অবস্থানে রয়েছে এবং মহাবিশ্ব ও সূর্যসহ সবকিছু তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। পাশ্চাত্যে মহাবিশ্ব সম্পর্কিত এই ভূকেন্দ্রিক মতবাদ টলেমির (Ptolemy) সময়কাল থেকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ১৫১২ সালে নিকোলাস কপার্নিকাস (Nicholas Copernicus) তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক আবর্তন মতবাদ প্রকাশ করেন। কপার্নিকাসের মতবাদ অনুযায়ী সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে সূর্য স্থির হয়ে আছে এবং গ্রহসমূহ সূর্যকে ঘিরে থাকা কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে।

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী ইয়োহানাস কেপলার (Yohannus Keplar) তাঁর Astronomia Nova নামক মহাশূন্য গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে বলা হয় গ্রহসমূহ শুধুমাত্র যে উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাই নয়, তারা নিজস্ব অক্ষরেখা ধরেও বিরামহীন গতিতে আবর্তিত হচ্ছে। কেপলারের এই তত্ত্বের প্রেক্ষিতে দিন রাত্রি সৃষ্টির কারণসহ সৌরমণ্ডল সম্পর্কিত বহু সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া পরবর্তী ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হয়।

উপরোক্ত আবিষ্কারগুলোর ফলে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, সূর্য স্থির্ পৃথিবীর মতো সূর্য তার নিজস্ব অক্ষরেখায় আবর্তনশীল নয়। আমার মনে আছে স্কুল জীবনে ভূগোল বইতেও এই ভুল তথ্য ছিল। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের ভাষ্য আমরা অনুধাবন করতে পারি :

"আল্লাহ্ই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। সকল মহাজাগতিক বস্তুই নিজ নিজ কক্ষপথে বৃত্তাকারে আবর্তন করে।" *(আল কুরআন ২১: ৩৩)*

উপরোক্ত আয়াতে যে আরবি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে 'ইয়াসবাহুন'। ইয়াসবাহুন শব্দটি এসেছে 'সাবাহ' শব্দ থেকে, এই শব্দটি গতিশীল যেকোনো বস্তু থেকে সৃষ্ট গতিধারা সম্পৃক্ত। যদি কোনো জায়গায় বিচরণরত মানুষের ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার করা হয় তাহলে মানুষটি গড়াচ্ছে, এমন বোঝানো হবে না, বুঝতে হবে মানুষটি হাঁটছে কিংবা দৌড়াচ্ছে। পানিতে আছে এমন মানুষের ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার করলে সে ভাসছে এমন বোঝানো হবে না, এক্ষেত্রে বুঝতে হবে মানুষটি সাঁতার কাটছে।

একইভাবে সূর্য বা অন্য কোনো মহাজাগতিক বস্তুর ক্ষেত্রে 'ইয়াসবা' শব্দটি প্রয়োগ করা হলে এটা বোঝাবে না যে বস্তুটি শুধুমাত্র মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। বরং বোঝাবে যে বস্তুটি মহাশূন্যে নিজ অক্ষরেখা ধরে আবর্তন করছে। প্রায় সব স্কুল পাঠ্যপুস্তকেই উপরোক্ত বিষয়ে বলা হয় যে, সূর্য তার অক্ষরেখা ধরে আবর্তিত হচ্ছে। নিজ অক্ষরেখায় সূর্যের আবর্তনকে এখন প্রমাণ করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা এমন যন্ত্র তৈরি করেছেন যার সাহায্যে টেবিলের উপর ঘূর্ণায়মান সূর্যের ছায়া প্রতিফলিত করা যায়। ফলে চোখের কোনো ক্ষতি না করেই অক্ষরেখা ধরে সূর্যের আবর্তনকে প্রত্যক্ষ করা চলে। লক্ষ করা গেছে সূর্যের কিছু অন্ধকার অংশ প্রতি ২৫ দিনে একবার সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে ঘুরে আসছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, নিজ অক্ষরেখা আবর্তন করতে সূর্যের আনুমানিক ২৫ দিন লাগে।

প্রকৃত পক্ষে মহাশূন্যে সূর্যের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে গড়ে ১৫০ মাইল। এই গতিতে আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে প্রতিবার পরিক্রমণের জন্য সূর্যের সময় লাগে ২০ কোটি বৎসর।

"সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না, রাত্রি দিবসকে অতিক্রম করে না এবং মহাশূন্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।" *(আল কুরআন ৩৬:৪০)*

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ রয়েছে উপরোক্ত আয়াতে। সূর্য ও চন্দ্রের পৃথক কক্ষপথ রয়েছে যা তারা পরিক্রমণ করে নিজস্ব গতিবেগ নিয়ে এক 'নির্দিষ্ট স্থানের' দিকে, যে লক্ষ্যে সৌরমণ্ডলের নিরন্তর অভিযাত্রা, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী সেই স্থানকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে। লক্ষ্যস্থানের নাম দেওয়া হয়েছে সৌরশীর্ষ (Solar Apex)। সত্যিকার অর্থেই সৌরজগৎ হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জের (Alpha layer) একটি নির্দিষ্ট স্থানের দিকে মহাশূন্য পথে ধাবিত হচ্ছে। ঐ লক্ষ্যের মূল অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পৃথিবীকে একবার বৃত্তাকারভাবে ঘুরে আসতে চাঁদের যে সময় লাগে, নিজের কক্ষপথ পরিক্রমণ করতেও সেই একই সময় লাগে অর্থাৎ প্রতিবার পরিক্রমণের জন্য চাঁদের লাগে ২৯$^{১}/_{২}$ দিন। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে যে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক তথ্যের উল্লেখ আছে তা মানুষের জন্য এক মহাবিস্ময়। আমরা কি পরম আন্তরিকতা নিয়ে ভেবে দেখব না আল কুরআনের জ্ঞানগর্ভ ভাষ্যের উৎস কোথায়?

নির্দিষ্ট সময়ের পরে সূর্যের অস্তিত্ব থাকবে না

সূর্য থেকে যে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয় তার উৎস হচ্ছে সূর্যের অভ্যন্তরে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়া গত ৫০ হাজার কোটি বৎসর থেকে অবিরাম সংঘটিত হচ্ছে। ভবিষ্যৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে সৌর রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটবে এবং সূর্যের আলোক রশ্মি সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়ে যাবে। ফলে অনিবার্যভাবে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটবে এবং নিশ্চিহ্ন হবে পৃথিবী নামের গ্রহটি। সূর্যের অস্থায়িত্ব সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে :

"এবং সূর্য নির্দিষ্ট পথে চলে তার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং তা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্) কর্তৃক সুনির্দিষ্ট।" *(আল কুরআন ৩৬:৩৮)*

এখানে "মুসতাকার" আরবি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট স্থান বা সময়। সুতরাং আল কুরআনের ভাষ্যে সূর্য অবিরাম গতিতে ধাবিত হচ্ছে একটি পূর্ব চিহ্নিত স্থানের দিকে এবং পূর্বনির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত তার এই অভিযাত্রা। এর স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই যাত্রা এবং লক্ষ্যে পৌছানোর পর সূর্যের বিলুপ্তি ঘটবে এবং নিভে যাবে সহস্র কোটি বৎসরব্যাপী অবিরাম প্রজ্জ্বলিত রশ্মিধারা।

আল কুরআনে এই একই ধরনের বাণীর উল্লেখ আছে ১৩:২, ৩৫:১৩, ৩৯:৫ এবং ৩৯:২১ সূরা ও আয়াতসমূহে।

বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে মহাজাগতিক বস্তুর উপস্থিতি

পূর্বকালে ধারণা করা হতো মহা জাগতিক নক্ষত্রপুঞ্জ বা নীহারিকাসমূহের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলো একেবারেই শূন্য। অর্থাৎ সেখানে অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। নভোপদার্থবিদরা পরবর্তীকালে আবিষ্কার করেছেন বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলো আসলে শূন্য নয়। সেখানে রয়েছে অন্যান্য মহাজাগতিক পদার্থের সেতুবন্ধ। মহাজাগতিক পদার্থের সেতুবন্ধকে বলা হয় প্লাজমা (Plazma)। এগুলো সম্পূর্ণভাবে স্থলানুতে পরিবর্তিত (Ioniged) গ্যাসে তৈরি। এই স্থানুর সাথে সমপরিমাণে রয়েছে মুক্ত বিদ্যুৎ পরমাণু এবং ধনাত্মক স্থলানু (Positive Ions)। প্লাজমাকে (Plazma) অনেক সময় পদার্থের চতুর্থ পর্যায় হিসেবে অভিহিত করা হয় (পরিচিত তিনটি পর্যায় অর্থাৎ কঠিন, তরল এবং বায়বীয়-এর অতিরিক্ত রূপ)। মহাশূন্যের নক্ষত্র পুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে অন্যান্য মহাজাগতিক পদার্থের উপস্থিতি সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে :

"তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।" *(আল কুরআন ২৫ : ৬৯)*

বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে মহাজাগতিক বস্তুর উপস্থিতি ১৪০০ বৎসর পূর্বে মানুষের জানা ছিল- এটা যদি কেউ কল্পনাও করে তবে তা হবে নিছক এক হাস্যকর ব্যাপার।

ক্রম সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব

১৯২৫ সালে আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল (Edwin Huble) মহাবিশ্বের গতি প্রকৃতি বিশদভাবে পর্যবেক্ষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মহাকাশের নীহারিকাপুঞ্জ একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এতে বোঝা যায়, নভোমন্ডল ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। নভোমণ্ডলের এই সম্প্রসারণ বর্তমানে এক প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য। মহাবিশ্বের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে এই একই কথা আল কুরআনে বলা হয়েছে :

"আমরা আপন ক্ষমতা বলে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছি এবং আমরাই মহাশূন্যের অনন্ত ব্যাপ্তির স্রষ্টা।" *(আল কুরআন ৫১:৪৭)*

আরবি শব্দ 'মুজি'য়ুন' এখানে সম্প্রসারণশীল অর্থে উল্লেখিত। মুজি'য়ুন শব্দটি দিয়ে ক্রমসম্প্রসারণশীল অসীম ব্যাপ্তি সম্পন্ন নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে। স্টিফেন হকিং (Stephen Hawking) তার *A brief History of Times* গ্রন্থে বলেন, "নভোমণ্ডল যে সম্প্রসারিত হচ্ছে এই তথ্য আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ঘটনা।"

মানুষ যখন টেলিস্কোপ তৈরি করেনি সে সময় আল কুরআনে নভোমণ্ডলের সম্প্রসারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলতে পারেন আল কুরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞানমূলক তথ্যের উল্লেখ কোনো আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কারণ আরবরা জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক অগ্রসর ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আরবদের পারঙ্গমতাকে তারা

যে স্বীকার করেছেন, সেটা ঠিকই হয়েছে। কিন্তু তারা এই সত্যটি লক্ষ্য করতে ভুলে গিয়েছেন আল কুরআন নাজিল হয় আরবরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জনের বহু শত বৎসর পূর্বে। তাছাড়া আল কুরআনে মহাবিশ্ব সৃষ্টির উৎস হিসেবে Big bang তত্ত্বসহ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যেসব তথ্যকে সৃষ্টির উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের চূড়ান্ত উন্নতির সময়েও সেটা তাদের অজানা ছিল। কাজেই স্পষ্টতই প্রমাণ হচ্ছে যে, আল কুরআনে যে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ উল্লেখিত হয়েছে সেটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের অগ্রগতির ফলশ্রুতি নয়। এক্ষেত্রে সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আরবরা অনেক অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছিলেন, কারণ আল কুরআন তাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

পদার্থবিদ্যা

পরমাণুর ভগ্নাংশের অস্তিত্ব

প্রাচীনকালে Theory of Atomism বা আণবিক তত্ত্ব ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। গ্রিক বিজ্ঞানীরা এবং বিশেষভাবে ডেমোক্রিটাস (Democritus) নামে গ্রিসের এক বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। তাঁর সময়কাল ছিল খৃষ্টপূর্ব ২৩ শতকের আগে। ডেমাক্রিটাস এবং তাঁর সহযোগীরা বিশ্বাস করতেন পদার্থের সর্বাতিক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে 'অণু'। তৎকালীন আরবরাও এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। আরবি শব্দ 'ধারাহ্' (dharrah) সাধারণত: অণুকেই বোঝাতো। সাম্প্রতিককালে আধুনিক বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন এই সর্বাতিক্ষুদ্র অণুকেও বিভক্ত করা সম্ভব। এই তত্ত্বের উদ্ভব বিংশ শতাব্দীতে। ১৪০০ বৎসর পূর্বে একজন আরবের কাছেও এই তত্ত্ব অস্বাভাবিক ও ভিত্তিহীন মনে হতো। ধারাহই তাদের কাছে বিবেচিত

হতো এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ সীমারেখা হিসেবে। কিন্তু আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে উক্ত সীমারেখাকে বাতিল করা হয়েছে :

"অবিশ্বাসীরা বলে আমরা কেয়ামতের সম্মুখীন হব না। বল, কেন হবে না, আমার রবের শপথ, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কেয়ামতের সম্মুখীন হতে হবে তাঁর নির্দেশে যিনি অদৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে অণুপরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনো কিছুই যাঁর অগোচর নয় এবং সব কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে।" *(আল কুরআন ৩৪:৩)*

মহান স্রষ্টা আল্লাহ যে সর্বজ্ঞাত এই আয়াতে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি প্রকাশ্য বা গোপন সব কিছু সম্পর্কেই অবহিত। উক্ত আয়াতে কারিমায় আরো বলা হয়েছে 'অণু' থেকে বড়ো বা ছোট বস্তুসহ মহাবিশ্বের সবকিছু সম্পর্কেই আল্লাহ, জ্ঞাত রয়েছেন। কাজেই এখানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বোঝানো হয়েছে 'অণুর' চেয়েও ক্ষুদ্র কিছুর অস্তিত্ব থাকা খুবই সম্ভব। ১৪০০ বৎসর পূর্বে নাজিলকৃত আল কুরআনে উল্লেখিত এই তথ্য সম্প্রতি আধুনিক বিজ্ঞান নতুন করে আবিষ্কার করেছে। আর এই আবিষ্কারে প্রতিফলিত হয়েছে আল কুরআনে উল্লেখিত তথ্যেরই সত্যতা।

আল কুরআনের ১০ নং সূরার ৬১ নং আয়াতেও অনুরূপ ভাষ্য দৃঢ়তার সাথে উল্লেখিত হয়েছে।

ভূগোল

পানিচক্র

১৫৮০ সালে বার্নার্ড প্যালিসি (Bernard Palisy) প্রথম বর্তমান সময়ে প্রচলিত এবং স্বীকৃত 'পানিচক্র' তত্ত্বের উল্লেখ করেন। তিনি বর্ণনা করেন পানি সমুদ্র, মহাসমুদ্র থেকে বাষ্পীভূত হয়ে শূন্যে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে মেঘে রূপান্তরিত হয়। মেঘ জমাট বাঁধে এবং শেষ পর্যন্ত ভূখণ্ডসহ অনেক জায়গা জুড়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। বৃষ্টির পানিতে নদ, নদী, নালা সৃষ্টি হয় এবং আবার সেই পথে পানি প্রবাহ সমুদ্রে ফিরে যায়। উক্ত পানিচক্রের ক্রমাগত এই পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতকে মাইলেটাসের থেলস (Thales of Miletus) বিশ্বাস করতেন সমুদ্র থেকে উত্থিত প্রস্রবন বায়ু তাড়িত হয়ে ভূ-ভাগে এসে বৃষ্টি রূপে বর্ষিত হয়। বহু প্রাচীনকালে মানুষ ভূগর্ভস্থ পানির উৎস সম্পর্কে অবহিত ছিল। তাদের ধারণা ছিল সমুদ্রের পানি বাতাসের তোড়ে মহাদেশীয় ভূখণ্ডে আসে এবং পরে মাটির নিচের এক গভীর সুড়ঙ্গ পথে মহাসমুদ্রে ফিরে যায়। ভূভাগের অভ্যন্তরের

সাথে মহাসাগরের এই গভীর সুড়ঙ্গকে বলা হতো 'তার্তারাস' (Tartarus)। অষ্টাদশ শতকের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডেকার্টে (Descartes) এই ধারণা পোষণ করতেন। ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত অ্যারিস্টটল (Aristotle)-এর প্রাচীন তত্ত্বই পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল। তিনি মনে করতেন পর্বতের শীতল গভীর খাদে পানি ঘনীভূত হয়ে ভূগর্ভে হ্রদের সৃষ্টি করে। এই হ্রদের পানিই উচ্ছৃত হয় প্রস্রবণের আকারে। আজকের দিনে আমরা জানি ভূমির ফাটল দিয়ে নিচে প্রবেশ করা বৃষ্টির পানিই এই সমস্ত প্রস্রবণের উৎস। আল কুরআনে পানির এই নিরন্তর চক্রের বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে :

"তোমরা কি দেখনা, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূমিতে স্রোতরূপে প্রবাহিত করেন এবং তা দিয়ে বিবিধ বর্ণের (ফসল) উৎপন্ন করেন?" *(আল কুরআন ৩৯:২১)*

অন্যত্র : "তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং মৃত ভূমিকে জীবিত করে তোলেন। এর মধ্যে অবশ্যই জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" *(আল কুরআন ৩০:২৪)*

এছাড়া : "এবং আমরা আকাশ থেকে পরিমিত পরিমাণ বারি বর্ষণ করি। অতঃপর আমরা তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি এবং বারিধারাকে নিঃসরিত করতেও আমরা (সহজেই) সক্ষম।" *(আল কুরআন ২৩:১৮)*

১৪শ বৎসর পূর্বের আর কোনো গ্রন্থেই আবহমানকালের পানিচক্রের এমন নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া হয়নি।

বাতাস মেঘকে উর্বর করে তোলে

"আমরা বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, পরে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের প্রচুর পরিমাণে প্রদান করি" *(আল কুরআন ১৫:২২)*

'লাওয়াকিহ্' (Lawakih) আরবি শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। 'লাকিহ্' (laqih) শব্দটির বহুবচন হচ্ছে লাওয়াকিহ্। লাকিহ্ শব্দটি এসেছে লাকাহা (laqaha) থেকে। এর অর্থ হচ্ছে উর্বর করা বা গর্ভবতী করা। এখানে উর্বর করা এই অর্থে বলা হয়েছে বাতাসের তোড়ে মেঘ খণ্ডগুলো পরস্পরের সাথে সম্মিলিত হয় এবং মেঘমালার ঘনত্ব বেড়ে যায়, ফলে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে এবং বৃষ্টি নামে। একই বর্ণনা রয়েছে আল কুরআনেঃ

"আল্লাহ, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, তিনি মেঘকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন। পরে তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তোমরা দেখতে পাও তা থেকে বারিধারা নির্গত হয়, তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা বারিধারা দান করেন, তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়। *(আল কুরআন ৩০:৪৮)*

আল কুরআনের ভাষ্য সর্বাংশে নিখুঁত এবং সেগুলো বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পানিচক্র বিষয়ে আল কুরআনের বিভিন্ন সূরায় তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত সূরা ও আয়াতসমূহের উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ ৩:৯, ৭:৫৭, ১৩:১৭, ২৫:৪৮-৪৯, ৩৬:৩৪, ৫০:৯-১১, ৫৬:৬৮-৭০, ৬৭:৩০ এবং ৮৬:১১

ভূতত্ত্ব

পর্বতসমূহ কীলকাকার

ভূতত্ত্ববিদ্যায় ভাঁজ বা কুণ্ডলী সংক্রান্ত বিক্রিয়া এক অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত তত্ত্ব। পর্বতমালা গঠনে মূল ভূমিকায় রয়েছে কুণ্ডলীসম্পৃক্ত বিক্রিয়া। ভূত্বক, যার উপরে আমরা বাস করি, প্রকৃতপক্ষে একটি নিরেট গোলকের (Shell) মতো। ভূত্বকের নিচের গভীর স্তরগুলো তরল এবং অত্যন্ত উচ্চতাপসম্পন্ন। ফলে সকল ধরনের প্রাণের অস্তি ত্বের প্রতিকূল। ভূবিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে পর্বতমালার দৃঢ় স্থাপনা প্রধানত: ভূস্তরের কুণ্ডলীময় বিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। আগেই বলা হয়েছে পর্বতমালার গঠনেও কুণ্ডলীসম্পৃক্ত বিক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ভূবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে জানা গেছে পৃথিবীর ব্যাস ৩৭৫০ মাইল এবং যে ভূত্বকের উপর আমরা বাস করি তা খুবই পাতলা। ভূত্বকের পুরুত্ব ১ থেকে ৩০ মাইলের মধ্যে সীমিত। ভূত্বক পাতলা হওয়ার কারণে এর কম্পনের সম্ভাবনা প্রবল।

কীলকের মতো অথবা তাবুর খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে থাকা পর্বতমালা ভূত্বককে ধরে রাখে এবং ভূত্বক পায় স্থিতি। আল কুরআনের নিম্মোক্ত আয়াতে অনুরূপ বক্তব্যই দেওয়া হয়েছে ঃ

"আমরা কি ভূমিকে ব্যাপক বিস্তৃত এবং পর্বতকে কীলক সদৃশ করিনি?" *(আল কুরআন ৭৮:৬-৭)*

আরবি 'আওতাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে দণ্ড, খুঁটি বা কীলক (যা তাঁবু তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়)। পর্বতমালা অত্যন্ত শক্তভাবে স্থাপিত কীলক বা খুঁটির মতোই কাজ করে ভূত্বকের স্থিতির জন্য। পৃথিবীর অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই 'আর্থ' (Earth) নামক একটি গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক রূপে প্রচলিত। পুস্তকটিতে ভূবিজ্ঞান সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি রয়েছে। এই পুস্তক রচয়িতাদের অন্যতম হচ্ছেন ফ্রাংক প্রেস (Frank Press)। তিনি ১২ বৎসর ইউএস একাডেমি অব সায়েন্সের (U.S. Academy of Science) প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এছাড়া তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের (Jimmy Carter) বিজ্ঞান উপদেষ্টার দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি 'আর্থ' পুস্তকে পর্বতকে কীলকাকার হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই কীলক সমগ্র ভূকাঠামোর একটি অংশ। এর ভিত্তি ভূপৃষ্ঠের অনেক গভীরে স্থাপিত। ডা. প্রেসের মতে ভূত্বকের স্থিতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে পর্বতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভূত্বকের কসম্পনরোধে পর্বতের ভূমিকা সম্পর্কে আল কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে ঃ

"এবং আমরা পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত সৃষ্টি করেছি যাতে সেগুলো পৃথিবীসহ কম্পিত না হয় (হেলে না যায়)। *(আল কুরআন ২১:৩১)*

আধুনিক ভূবিজ্ঞানের তথ্যের সাথে আল কুরআনের ভাষ্যের পুরোপুরি মিল রয়েছে।

পর্বতমালা দৃঢ়ভাবে স্থাপিত

ভূপৃষ্ঠ বহু কঠিন অংশে (Plate) বিভক্ত। কোনো কোনো স্তর ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পুরু। এই সব অংশ বা Plate আংশিকভাবে গলিত তরলের উপর ভাসমান। এই আংশিক তরল এলাকাকে বলা হয় Aesthenosphere. পর্বতমালা গঠিত হয় এই সমস্ত স্তর বা Plate এর প্রান্তসীমায়। মহাসমূদ্রের নিচে ভূত্বক ৫ কিলোমিটার পুরু, মহাদেশীয় সমতলের নিচে ৩৫ কিলোমিটার এবং বিশাল পর্বতমালাসমূহের নিচে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পুরু। উল্লেখিত দৃঢ় ভিত্তিগুলোর উপরই পর্বতমালাসমূহের স্থিতি। আল কুরআনেও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পর্বতমালার উল্লেখ রয়েছে "এবং পর্বতমালাসমূহকে তিনি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছেন"। *(আল কুরআন ৭৯:৩২)*

"Earth, Press and Siever, P. 435, আরো দেখুন Earth Science, Tarbuck and Lutgens p-157."

আল কুরআনের ৮৮:১৯, ৩১:১০ এবং ১৬:১৫ আয়াতে কারীমায় অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

সমুদ্র বিজ্ঞান

মিঠা পানি এবং লোনা পানির মধ্যবর্তী অদৃশ্য বিভাজন প্রাচীর

শুরুতেই বিবেচনা করা যেতে পারে আল কুরআন-এর নিম্নোক্ত আয়াত:

"তিনি প্রবাহিত করেন পাশাপাশি দুই সমুদ্র। উভয়ের মধ্যে রয়েছে অনতিক্রম্য বিভাজন প্রাচীর" *(আল কুরআন ৫৫:১৯-২০)*

আরবি ভাষায় 'বারজাখ' শব্দটি বাধার প্রাচীর বা বিভাজক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে বাধার প্রাচীর বলতে বস্তুগত কোনো বিভাজন রেখা বোঝানো হয়নি। এই প্রসঙ্গে আর একটি আরবি শব্দের উল্লেখ করা যায়। সেটি হচ্ছে 'মারাজা'। এর আক্ষরিক অর্থ "তারা উভয়ে মিলিত হয় এবং পরস্পরের সাথে মিশে যায়"। প্রাথমিক টিকাকারদের পক্ষে পানি সম্পর্কিত ঐ দু'টি শব্দের পরস্পর বিরোধী দু'টি অর্থের যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি, অর্থাৎ "তারা মিলিত হয় এবং পরস্পরের সাথে মিশে যায়- অথচ একই সাথে বলা হচ্ছে

দুই ধরনের পানির মধ্যে রয়েছে বাধার দেওয়াল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয়েছে দুটো পৃথক সমুদ্র যেখানে মিলিত হয় সেখানে রয়েছে ব্যাখ্যার অতীত এক অদৃশ্য বাধার দেওয়াল। এই দেওয়াল সমুদ্র দু'টির পানিকে পৃথক করে রাখে যাতে দুটো সমুদ্রেরই নিজস্ব এলাকায় নিজস্ব তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও ঘনত্ব বজায় থাকে। সমুদ্র বিজ্ঞানীদের পক্ষে আল কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দেওয়া আরো সহজ হয়েছে। দু'টি সমুদ্র যেখানে মেশে সেখানে তির্যক এক অদৃশ্য বিভাজন প্রাচীর রয়েছে সেই প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এক সমুদ্রের পানি মিলিত হয় অন্য সমুদ্রের সাথে।

একটি সমুদ্রের পানি যখন বিভাজন প্রাচীরের ভেতর দিয়ে অন্য সমুদ্রে ঢুকে পড়ে তখন কিন্তু ঐ পানির আগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর থাকে না। সংশ্লিষ্ট সমুদ্রের পানির সাথে একাকার হয়ে যায়। পূর্বোক্ত বিভাজন প্রাচীর দু'টি সমুদ্রের সমপ্রকৃতি ঘটার মিলনস্থল হিসেবে বিদ্যমান। ("Principles of Oceanography, Davis, pp. 92-93)

আল কুরআনে উল্লেখিত উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন বিশিষ্ট সমুদ্র বিজ্ঞানী এবং যুক্তরাষ্ট্রের কলরেডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যাপক ড. উইলিয়াম হে (Dr. Wiliam Hay)। আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেও উক্ত পরিস্থিতির উল্লেখ রয়েছে :

"এবং সৃষ্টি করেছেন প্রবহমান দু'টি জলধারার মধ্যে এক বিভাজন প্রাচীর" *(আল কুরআন ২৭: ৬১)*

উক্ত পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বহু জায়গায়। এ প্রসঙ্গে জিব্রাল্টারের উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে আটলান্টিক

মহাসাগরের সাথে ভূ-মধ্যসাগরের জলরাশির মিলনস্থলে রয়েছে অদৃশ্য বিভাজন রেখা। এভাবেই আল কুরআনে যখন মিঠা পানি ও লোনাপানির মধ্যবর্তী বিভক্তি রেখার কথা বলা হয়, তখন বলা হয় এই বিভক্তি রেখার সাথে রয়েছে এক অনতিক্রম্য বিভাজন প্রাচীর।

আল কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

"তিনিই দু'টি জলধারাকে প্রবাহিত করেছেন। একটির পানি মিষ্ট ও সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা ও তিক্ত। উভয়ের মধ্যে তিনি রেখেছেন এক সীমারেখা, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।" *(আল কুরআন ২৫:৫৩)*

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে দেখা যায়, যে মোহনায় মিঠা পানি ও লোনাপানি মিলিত হয় সেখানকার পরিস্থিতি দু'টি সমুদ্রের মিলনস্থলের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। বৈজ্ঞানিকেরা আরো আবিষ্কার করেছেন সাগর মোহনার মিঠা পানিকে লোনা পানি থেকে ভিন্নতর করার মূলে রয়েছে এমন একটি বিভাজন স্থল যা সমুদ্র বিজ্ঞানে Pycroline zone নামে অভিহিত। Pycroline zone- এর বৈশিষ্ট হচ্ছে দুটি জল রাশির ঘনত্বের সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয় তারতম্য, যা দু'টি জলরাশিকে অদৃশ্যভাবে বিভক্ত করে রাখে। এই জলারাশির মিলনস্থলের বিভাজনস্থলের লবণাক্ততা মিঠা পানি এবং লোনা পানি উভয় থেকে আলাদা ধরনের।

Oceanography, Gross, P.242 এছাড়াও দেখুন Introductory Oceanography, pp 300-301।

Oceanography, Gross, p.244 এবং Introductory Oceanography, Thurman, pp 300-301। এবং

মিসরসহ পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই এরূপ বাস্তবতার অস্তিত্ব রয়েছে। নীল নদের পানি ভূমধ্যসাগরে গিয়ে মেশে। কিন্তু মিলনস্থলে অদৃশ্য বিভাজন রেখার দুই পার্শ্বে জলরাশির রয়েছে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য।

সমুদ্র গভীরে প্রগাঢ় অন্ধকার

অধ্যাপক দুর্গাপ্রসাদ রাও একজন বিশিষ্ট সামুদ্রিক ভূতত্ত্ববিদ। তিনি জেদ্দাস্থ কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে তাঁর অভিমত চাওয়া হয়েছিল :

"অথবা (অবিশ্বাসীদের অবস্থা) সমুদ্রের অতল অন্ধকার, তরঙ্গের পর তরঙ্গ যাকে উদ্বেলিত করে, যার ঊর্ধ্বদেশে ঘনমেঘ, এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার, কোন মানুষ হাত বের করলে তা একবোরেই দেখতে পাবে না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না তার জন্য অন্য কোনও জ্যোতি নেই।" *(আল কুরআন ২৪:৪০)*

উত্তরে অধ্যাপক ড. রাও (Dr Rao) বলেন : বিজ্ঞানীরা অতি সম্প্রতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পেরেছেন সমুদ্র-গভীরের অন্ধকার স্তর সম্পর্কে। মানুষ যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে সমুদ্রের ২০ থেকে ৩০ মিটারের বেশি গভীরে যেতে পারে না। গভীর সমুদ্র এলাকায় ২০০ মিটারের চেয়ে বেশি নিচে গেলে মানুষের পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব নয়। আল কুরআনে পৃথিবীর সকল সমুদ্র সম্পর্কে এই উক্তি করা হয়নি। কারণ সব সমুদ্রের গভীরেই একের উপর আর এক অন্ধকার স্তর নেই। আল কুরআনে নির্দিষ্ট একটি গভীর সাগর কিংবা মহাসাগরের উল্লেখ করা হয়েছে :

"বিশাল এক সাগর গভীরের অন্ধকার।" এই অবস্থা গভীর এক সমুদ্রের অতলে স্তরে স্তরে ঘনীভূত অন্ধকারে অবস্থিত দু'টি মৌলিক কারণের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট ঃ

১/একটি আলোকরশ্মিতে থাকে সাতটি রং। এগুলো হচ্ছে : বেগুনি, নীলাভ বেগুনি, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। আলোকরশ্মি যখন পানিতে পড়ে বা প্রবেশ করে তখন পানিতে তা নিঃসরিত হতে থাকে। পানির উর্ধ্বস্তরের থেকে মিটার পর্যন্ত ব্যাপ্তিতে আলোর লাল রং সম্পূর্ণ নিঃসরিত হয়ে যায়। কাজেই কোনো ডুবুরি যদি পানির ২৫ মিটারের নীচে থাকাকালে আহত হয় এবং রক্ত ঝরে তাহলে সে তার রক্তের লাল রং দেখতে পাবে না। কারণ ঐ গভীরতা পর্যন্ত লাল রং পৌছুতে পারে না, তার আগেই নিঃসরিত হয়ে যায়। একইভাবে ৩০ থেকে ৫০ মিটারের মধ্যে কমলা রঙের অস্তিত্ব, ৫০ থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে হলুদ রং, ১০০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে সবুজ রং, ২০০ মিটারের চেয়ে গভীরে নীল রং এবং অবশেষে বেগুনী ও বেগুনী নীল ২০০ মিটারের কাছাকাছি অবস্থানে আলো থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। স্তর থেকে স্তরে নামার সাথে রং গুলো নিঃশেষিত হবার ফলশ্রুতিতে সাগর গর্ভে ক্রমেই বেশি অন্ধকার ঘনীভূত হতে থাকে। অতঃপর ১০০০ মিটারে শুধু থাকে জমাট বাঁধা অন্ধকার।

২/ প্রথমে সূর্যের আলো যখন মেঘে এসে পড়ে তখন মেঘে বিশোষিত হয় সেই আলো। এরপর মেঘ থেকে সেই আলো প্রতিফলিত হতে থাকে। উপরের স্তরে যখন মেঘে এই আলোক বিচ্ছুরিত হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই মেঘস্তরের নিচে সৃষ্টি হয়

অন্ধকারের একটি স্তর। এটা অন্ধকারের প্রথম স্তর। একই ভাবে যখন আলোকরশ্মি সমুদ্রের উপরিভাবে এসে পড়ে তখন তরঙ্গে প্রতিফলিত হয়ে এক উজ্জ্বল প্রভার সৃষ্টি করে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তরঙ্গমালাই আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করে এবং নিম্নবর্তী স্তরে সৃষ্টি করে অন্ধকারের আবরণ। অন্যদিকে আলোকরশ্মির অপ্রতিফলিত অংশটি সমুদ্রগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। কাজেই এটা বোঝা যাচ্ছে, সমুদ্র গর্ভের দুইটি অংশ রয়েছে। উপরিভাগে থাকে তাপ যা সমুদ্রপৃষ্ঠের সাথে সমুদ্রগভীরের জলরাশির মধ্যে বিভাজনকে আরো বেশি চিহ্নিত করে তোলে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের অনেক নিচে অভ্যন্তরীণ তরঙ্গমালা থাকে গভীর জলরাশির সাথেই একান্তভাবে সম্পৃক্ত। কারন সমুদ্র গভীরের জলরাশির ঘনত্ব সমুদ্র পৃষ্ঠের চেয়ে অনেক বেশি। উপরে উল্লেখিত অভ্যন্তরীণ তরঙ্গমালার নিচ থেকেই শুরু হয় অন্ধকার। এই অন্ধকার এত বেশি গাঢ় যে, সমুদ্রগভীরে বিচরণকারী মাছও দেখতে পায় না। তাদের আলোর একমাত্র উৎস নিজেদের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত আলো।

Oceans, Elder and Pernetta. p. 27.

আল কুরআনে এই অবস্থার সঠিক বর্ণনা রয়েছে :-

"একটি গভীর সমুদ্রের বিশাল ব্যাপ্তিতে রয়েছে ঘনীভূত অন্ধকার এবং অন্ধকারকে আবরিত করা তরঙ্গের উপরে রয়েছে তরঙ্গমালা।" অন্য কথায় বলতে গেলে বলা যায়, অভ্যন্তরীণ তরঙ্গমালার উর্ধ্বে

আরো তরঙ্গমালা।" উর্ধ্বে রয়েছে আরো তরঙ্গমালা বলতে বোঝানো হয়েছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উত্তাল তরঙ্গকে। আল কুরআনের ভাষ্যে আরো বলা হয়েছে :

"গভীর ঘনীভূত অন্ধকারে আচ্ছাদিত করে রয়েছে প্রগাঢ় মেঘের স্তর, এই স্তরগুলো একটির উপরে একটি করে সাজানো।"

উপরে উল্লেখিত মেঘমালা প্রকৃতপক্ষে রচনা করে অদৃশ্য বিভাজন প্রাচীর। একটা উপর আর একটা। এই সব স্তরে আলোর সব রং বিশোষিত হয়ে অন্ধকার গাঢ়তর হয়।

অধ্যাপক দূর্গা রাও উপসংহারে বলেন :

"১৪০০ বৎসর আগে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে উপরোক্ত বিষয়ের এত বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। কাজেই এই সব তথ্য নিশ্চিতভাবে কোনো অতিপ্রাকৃত উৎস থেকে এসেছে।"

জীববিদ্যা

সকল জীবন্ত বস্তুর উদ্ভবের উৎসে রয়েছে পানি

আল কুরআনের এই ভাষ্যটি বিবেচনা করা যেতে পারে :

"অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে আকাশ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল; পরে আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম; এবং সকল প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?" *(আল কুরআন ২১ : ৩০)*

বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং বহু গবেষণার পরই আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রতিটি দেহকোষের Cytoplasm নামক মূল উপাদানের শতকরা ৮০ ভাগই হচ্ছে পানি। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আরো প্রমাণিত হয়েছে, প্রতিটি জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদের পূর্ণ অবয়বের ৫০% থেকে ৯০% ভাগ হচ্ছে পানি। এ ছাড়া প্রতিটি জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য পানির অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে। ১৪০০ বৎসর আগে কোনো মানুষের পক্ষে কি ধারণা করা সম্ভব ছিল যে, প্রতিটি

জীবিত সত্তার উদ্ভবের মূলে রয়েছে পানি! তা ছাড়া চির পানি সংকটের এলাকা আরবের কোনো মানুষ উপরোক্ত তথ্যের উল্লেখ করেছিলেন- এটা কি ভাবা যায়?

আল কুরআনের একটি ভাষ্যে পানি থেকে সমস্ত প্রাণের সৃষ্টির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

"এবং আল্লাহ্ই সমস্ত প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" *(আল কুরআন ২৪:৪৫)*

আল কুরআনের নিম্নোক্ত ভাষ্যেও পানি থেকে মানুষের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে :

"তিনিই সেই সত্তা যিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন: অতঃপর তিনি রক্তগত সম্পর্ক এবং বিবাহ্ প্রথা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কারণ আপনার প্রভুই সর্বশক্তিমান (সব কিছুর উপরে)।" *(আল কুরআন ২৫:৫৪)*

উদ্ভিদবিদ্যা

উদ্ভিদকে সৃষ্টি করা হয়েছে জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী বৈশিষ্ট্য দিয়ে

পূর্বকালে মানুষের জানা ছিল না যে, উদ্ভিদসমূহের মধ্যেও পুরুষ ও নারীর পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে প্রতিটি উদ্ভিদই পুরুষ ও নারী লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য দিয়ে গঠিত। একক লিঙ্গবিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যেও রয়েছে পুরুষ ও নারী লিঙ্গের উপাদান। কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে :

"আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করা হয়েছে এবং সেই পানি দিয়ে আমরা জোড়ায় জোড়ায় পৃথক পৃথক উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছি, যা একে অপর থেকে পৃথক।"

ফল সৃষ্টি করা হয়েছে জোড়ায় জোড়ায়, পুরুষ ও নারী

"এবং প্রত্যেক রকমের ফলই তিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, দুই এবং দুই" *(আল কুরআন ১৩:৩)*

উচ্চতর প্রকৃতির উদ্ভিদের প্রজনন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে সৃষ্টি হয় ফল। ফলের পূর্ববর্তী পর্যায় হচ্ছে ফুল।

ফুলে পুরুষ ও নারী সম্পৃক্ত উপাদান (পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর) থাকে। ফুলে পরাগ সংযোজিত হওয়ার পর তা ফলবান হয়ে ওঠে। ফল পূর্ণরূপ পাওয়ার পর উদ্ভিদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলের ভেতরই থাকে বীজ। এই বীজ থেকে আবার উদ্ভিদের জন্ম হয়। ফুল ফোটে। ফল ধরে। এভাবেই উদ্ভিদের জন্মচক্র আবর্তিত হতে থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে সমস্ত ফলেই বিদ্যমান থাকে পুরুষ ও নারী উপাদান। কুরআনুল কারিমেও এই তথ্যের উল্লেখ রয়েছে।

কোনো কোনো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পরাগ সংযোজিত হয়নি এমন ফুল থেকেও ফলের উৎপত্তি ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কলা, ডুমুর, কমলা এবং কিছু নির্দিষ্ট প্রকৃতির আনারস প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এই সব উদ্ভিদেরও সুনির্দিষ্ট লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে

আল কুরআনে বলা হয়েছে "এবং সব কিছুই আমরা জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।" *(আল কুরআন ৫১:৪৯)*

এখানে মানুষ পশু-পক্ষী, উদ্ভিদ ও ফল ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে বলা হয়েছে। এ ইঙ্গিত বিদ্যুতের মতো বিষয়ের দিকেও হতে পারে। বিদ্যুতের অনুকণাগুলো গঠিত হয় ঋণাত্মক [Negative] এবং ধনাত্মক [positive] ভাবে সঞ্চালিত ইলেকট্রন ও প্রোটন দ্বারা।

আল কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

“পবিত্র তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না তাদেরও প্রত্যেককে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।” *(আল কুরআন ৩৬:৩৬)*

কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথিবীতে উৎপন্ন সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মধ্যে এমন অনেক কিছুই রয়েছে মানুষ এখনোও যা জানে না, হয়ত পরে তা আবিষ্কৃত হবে।

প্রাণীবিদ্যা

পশু পাখিরা দল বেধে বাস করে

"পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী (যা জীবন্ত) নেই, বা এমন সত্ত্বা নেই যা পাখার সাহায্যে উড়ে বেড়ায় কিন্তু যারা তোমাদের মতো দলবদ্ধভাবে বাস করে না।" *(আল কুরআন ৬:৩৮)*

গবেষণায় দেখা গেছে, সকল প্রাণী ও পশুপক্ষী সম্প্রদায়গতভাবে বাস করে। অর্থাৎ তারা নিজেরা সংগঠিত হয় এবং একসাথে বাস ও কাজ করে।

পাখিদের শূন্যে ওড়া

শূন্যে ডানা মেলে পাখিদের ওড়া সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে:

"তারা কি লক্ষ্য করে না বিহঙ্গের প্রতি, যারা আকাশে সহজে বিচরণ করে? আল্লাহ তাদের শূন্যে স্থির রাখেন। এতে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য?" *(আল কুরআন ১৬:৭৯)*

একই ভাষ্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কুরআনুল কারিমের আর একটি সূরায় :

"ওরা কি আকাশে উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুলকে দেখে না যারা পাখা বিস্তার ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহই ওদের স্থির (ভাসমান অবস্থায়) রাখেন। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ ছাড়া (আল্লাহর শক্তি ছাড়া) আর কিছুই ওদের আকাশে স্থির রাখতে সক্ষম নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা। *(আল কুরআন ৬৭:১৯)*

আরবি শব্দ 'আমসাকা' বলতে আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয় কাউকে ধরা এবং পতন থেকে রক্ষা করতে ধরে রাখা। এই শব্দ দ্বারা এটাই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে আল্লাহ তাঁর মহান শক্তিবলে পাখিদের শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় রাখেন। উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্টরূপে বোঝা যায় আল্লাহর স্বর্গীয় মহিমার উপর পাখিদের ক্রিয়াকলাপ একান্তভাবে নির্ভরশীল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো কোনো জাতের পাখীর সুপরিকল্পিত এবং সুনির্ধারিতভাবে চলাফেরা এবং আচার আচরণের পরিচয় পাওয়া যায়। বাচ্চা পাখিরা কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা নির্দেশনা ছাড়াই কিভাবে দীর্ঘ এবং জটিল যাত্রাপথ পাড়ি দেয়, তার একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে তাদের প্রাণ কোষে (genetic code)- জন্মসূত্রেই পরিযায়ী গুণ সম্পৃক্ত থাকে। উল্লেখ্য, বাচ্চা পাখিদের পক্ষে যেখান থেকে যাত্রা শুরু নির্দিষ্ট সময় বা তারিখে সেখানেই ফিরে আসাও সম্ভব।

অধ্যাপক হামবার্গার (Prof. Hamburger) তার "Power and Fragility" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার 'মাটন

পাখি' উড়ন্ত যাত্রা পথে মাটন পাখিদের ওড়ার ধরন হচ্ছে ইংরেজি "8" ভঙ্গিতে। এই যাত্রায় তাদের সময় লাগে ছয় মাসের বেশি। যাত্রা স্থানে তাদের ফিরে আসতে প্রায় একই সময় লাগে। কখনো হয়তো ফিরতে সপ্তাহ খানেক দেরি হয়ে যায়। এ ধরনের জটিল ও দীর্ঘ যাত্রার উপযুক্ত নির্দেশনা অবশ্যই মাটন পাখির স্নায়ুতন্ত্রেই থাকে। নিশ্চিতভাবে এই ক্রিয়াকলাপ সুপরিকল্পিত। কিন্তু এই 'পরিকল্পনাকারী (Programmer)' কে? সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা উচিত নয় কি?

মৌমাছি

"তোমার রব মৌমাছিকে নির্দেশ দিয়েছেন বাসা বানাও পাহাড়ে বৃক্ষে ও মানববসতিতে। এরপর ফল থেকে রস পান কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালক যে পদ্ধতি সহজ করেছেন তার অনুসরণ কর। *(আর কুরআন ১৬:৬৮-৬৯)*

মৌমাছিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য ১৯৭৩ সালে ভন ফ্রিস (Von Frisch)) নোবেল পুরস্কার পান। কোনো মৌমাছি যখন কোন ফুল বা ফুলের বাগানের সন্ধান পায় তখন সে ফিরে যায় এবং অন্য মৌমাছিদের ঐ ফুল বাগানের খবর পৌঁছে দেয়। এ ছাড়া যাতায়াত পথের নির্ভুল রেখাচিত্রও তাদের কাছে তুলে ধরে। এরপর মৌমাছিরা নির্দিষ্ট স্থানে যেতে শুরু করে। এই ঘটনাই Bee dance নামে পরিচিতি। মৌমাছির নতুন ফুল বা বাগানের সন্ধান নিয়ে ফিরে যাওয়া, শ্রমিক মৌমাছিদের কাছে সেই খবর পৌঁছে দেওয়া এবং নির্দিষ্ট স্থানে তাদের মধু

আহরণের বিষয়টি ছবি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পন্থা ব্যবহারের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে। আল কুরআনের উপরোক্ত ভাষ্যে মৌমাছি কী কৌশলে আল্লাহর দেওয়া প্রশস্ত পথের সন্ধান খুঁজে পায় তার বর্ণনা রয়েছে।

শ্রমিক বা সৈনিক মৌমাছি হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গের মৌমাছি, আল কুরআনের সূরা-নহ্ল এর ৪১৬ অধ্যায় ৬৮ এবং ৬৯ আয়াতে শ্রমিক বা সৈনিক মৌমাছির উল্লেখ প্রসঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গের (fasluki and kuli) ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, যে মৌমাছি খাদ্য সংগ্রহে বাসা ছেড়ে যায় সেটি স্ত্রী-মৌমাছি। স্পষ্ট করে এটাই বলা চলে যে, শ্রমিক বা সৈনিক মৌমাছি আসলে স্ত্রী-মৌমাছি। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের (Willam Shakespeare) Henry the Fourth নাটকের কিছু চরিত্র মৌমাছি সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখ করেছে মৌমাছিরা সৈনিক এবং তারা রাজার অধীন। এই বক্তব্য সঠিক নয়। শ্রমিক মৌমাছিরা প্রকৃত পক্ষে স্ত্রী-মৌমাছি এবং তাদের কোনো রাজা- মৌমাছি নেই, রয়েছে রাণী-মৌমাছি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই সত্য আবিষ্কার করতে ৩০০ বৎসর লেগেছে।

মাকড়সার জাল/বাসা খুবই ভঙ্গুর

আল কুরআনের সূরা আল আনকাবুত- এ বলা হয়েছে :

"যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের রক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা। যে নিজের ঘর (নিজেই) তৈরি করে এবং

ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম- যদি ওরা জানত।" *(আল কুরআন ২৯-৪১)*

কুরআনুল কারিমে শুধুমাত্র যে মাকড়সার জালকে অত্যন্ত পাতলা, সুক্ষ্ম ও দুর্বল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই নয়, মাকড়সার বাসায় বিরাজিত ভঙ্গুর সম্পর্কের কথাও বলা হয়েছে, স্ত্রী মাকড়সা প্রায়শ সঙ্গি পুরুষ মাকড়সাকে মেরে ফেলে।

পিঁপড়াদের জীবনাচরণ ও পারস্পরিক যোগাযোগ

কুরআনুল কারীমের এই আয়াতটি লক্ষ করুন :

'সুলায়মানের সম্মুখে তার বাহিনী জ্বিন, মানুষ ও পাখিদের সমবেত করা হলো এবং বিভিন্ন ব্যূহে বিন্যস্ত করা হলো। এই বাহিনী একটি পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছলে এক পিপীলিকা বললো, হে পিপীলিকা সকল তোমাদের বাসায় প্রবেশ কর, না করলে, সুলায়মানের বাহিনী তোমাদের পায়ের তলায় পিষে ফেলবে।" *(আল কুরআন ২৭:১৭-১৮)*

কুরআনুল কারিমে পিঁপড়ারা পরস্পরের সাথে কথা বলে এবং বাস্তবধর্মী বাণী বিনিময় করে বলে যে উল্লেখ রয়েছে তার প্রেক্ষিতে অতীতকালে হয়তো কিছু লোক উক্ত পবিত্র গ্রন্থকে রূপকথা হিসেবে উপহাস করেছে। কিন্তু ব্যাপক গবেষণায় সাম্প্রতিক সময়ে পিঁপড়ার জীবনাচরণ সম্পর্কে এমন বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যা আগে মানুষের জানা ছিল না। গবেষণায় দেখা গেছে সকল পশুপাখি বা কীটপতঙ্গের জীবনাচরণের মধ্যে পিঁপড়ার জীবনাচরণই মানব

সমাজের সাথে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গবেষণায় উদঘাটিত নিম্নোক্ত তথ্যাদি থেকে উপরোক্ত সত্য প্রমাণিত হয় :

১. মানুষের মতো পিঁপড়ারা মৃত পিঁপড়াকে সমাহিত করে।

২. পিঁপড়াদের রয়েছে সুশৃঙ্খল শ্রম বিভাজন কাঠামো। এই শ্রম বিভাজন কাঠামোতে নিয়োজিত রয়েছে ম্যানেজার, সুপারভাইজার, ফোরম্যান, শ্রমিক প্রভৃতি।

৩. কিছুদিন পরপরই পিঁপড়ারা একত্রে মিলিত হয় এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে।

৪. পিঁপড়াদের রয়েছে পারস্পরিক যোগাযোগের খুবই উন্নত মাধ্যম।

৫. পিঁপড়াদের বাজার বসে এবং সেখানে তারা পণ্য বিনিময় করে।

৬. শীত মৌসুমের জন্য পিঁপড়ারা যে শস্যদানা সঞ্চিত করে রাখে, সেই শস্যদানায় যদি শিকড় গজাতে থাকে, সেক্ষেত্রে পিঁপড়ারা ঐ শিকড় কেটে দেয়। শিকড় গজাতে দিলে শস্যদানা যে নষ্ট হয়ে যায় এটা যেন তাদের জানা। বৃষ্টির পানিতে শস্যদানা ভিজে গেলে পিঁপড়া তা রোদে শুকাতে দেয় এবং শুকিয়ে যাবার পর আবার সেই শস্যদানা ভেতরে নিয়ে রাখে যেন এটাও তাদের জানা যে শস্যদানা ভিজে গেলে আর্দ্রতার দরুন শস্যদানা থেকে শিকড় গজাবে এবং তা পচে যাবে।

ঔষধ

মধুতে রয়েছে রোগ নিরাময়ের উপাদান

মধুতে আছে রোগ নিরাময়ের উপাদান। বিভিন্ন ধরনের ফুল ও ফল থেকে মৌমাছিরা রস আহরণ করে এবং সেই রস দিয়ে তাদের দেহাভ্যন্তরে মধু তৈরি হয়। সেই মধু সঞ্চিত থাকে মৌমাছির দেহের মোম কোষের মধ্যে। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে মানুষ জানতে পেরেছে মৌমাছির পেট থেকে মধু নিঃসরিত হয়। অথচ ১৪০০ বৎসর আগে কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করা হয় :

"ওদের উদর থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, এতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে" *(আল কুরআন ১৬:৬৯)*

এখন আমরা জানি মধুর মধ্যে রয়েছে পচন নিরোধসহ রোগনিরাময়ের অনেক উপাদান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে রুশ সৈনিকরা যুদ্ধের সময় দেহের ক্ষতস্থানে মধুর প্রলেপ দিতো। মধুর প্রলেপের ফলে ক্ষতের দাগ খুবই কম থাকতো। মধুর ঘনত্বের দরুন ক্ষতে

ছত্রাক কিংবা জীবাণু উদ্ভবের আশঙ্কা থাকতো না। কোনো ব্যক্তির যদি কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদের Allergy থাকে, তাদের সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদের মধু খাওয়ানো যেতে পারে। ফলে তার দেহে প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। মধু শর্করা এবং ভিটামিন 'কে' সমৃদ্ধ। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সাম্প্রতিক গবেষণায় মধু সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, কুরআনুল কারিমে তার বহু পূর্বেই মধু, মধুর উৎস এবং মধুর উপাদানসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে।

শরীর বিদ্যা

প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন ধারা সংক্রান্ত বিজ্ঞান

মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে নাফিস দেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়ার ৬০০ বৎসর পূর্বে এবং ইউলিয়াম হারওয়ের (Wiliam Harwey) রক্ত সঞ্চালন তত্ত্ব পাশ্চাত্যে প্রচারের ১০০০ বৎসর পূর্বে আল কুরআন নাজিল হয়। প্রাণীদেহের বিভিন্ন অঙ্গের পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য হজম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণী দেহের অন্ত্রসমূহের বিক্রিয়া সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রচারের মোটামুটি ১৩০০ বৎসর পূর্বে আল কুরআনের একটি আয়াতে এ সম্পর্কে যে তথ্যের উল্লেখ করা হয়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে তার সার্বিক সাজুয্য রয়েছে।

উপরোক্ত তত্ত্ব সম্পর্কিত আল কুরআনের বাণীর অর্থ যথাযথভাবে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টার পূর্বে জানা দরকার প্রাণীদেহের অভ্যন্তরে অন্ত্রসমূহের রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি। এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য থেকে আহরিত নির্যাস জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তপ্রবাহে প্রবিষ্ট হয়। কখনো ঐ নির্যাস যকৃতের সাহায্যেও রক্ত ধারায় মিশ্রিত হয়। তবে রক্তের সাথে খাদ্যরসের এই মিশ্র প্রক্রিয়া

মূলত নির্ভর করে খাদ্য নির্যাসের রাসায়নিক প্রকৃতির উপর। রক্ত প্রবাহ খাদ্য নির্যাসকে দুগ্ধ উৎপাদক স্তন গ্রন্থিসহ দেহের সকল অঙ্গে পৌঁছে দেয়।

সহজ কথায় বলা যায়, অন্ত্রে আহরিত খাদ্য নির্যাসের কিছু কিছু উপাদান অন্ত্রের দেওয়াল প্রবেশ করে এবং রক্ত প্রবাহ তাদের পৌঁছে দেয় দেহের বিভিন্ন অঙ্গে।

যদি আমরা আল কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের মর্মবাণী সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে চাই তাহলে আমাদেরকে প্রথমেই উপরের তথ্যাবলী অনুধাবন করতে হবে।

আল কুরআনে বলা হয়েছে :

"অবশ্যই গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাদের উদরস্থ বস্তু এবং রক্ত থেকে নিঃসৃত পরিচ্ছন্ন দুগ্ধ তোমাদের পান করাই, যা পানকারিদের জন্য সুস্বাদু।" *(আল কুরআন ১৬:৬৬)*

"এবং চতুষ্পদ জন্তুতে তোমাদের শিক্ষণীয় বিষয় আছে; তোমাদেরকে আমি তাদের উদরে যা আছে (দুগ্ধ) তা পান করাই এবং এগুলোতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকারিতা রয়েছে। তোমরা ওদের গোশতও খাও।" *(আল কুরআন ২৩:২১)*

গবাদি পশুর দেহে দুগ্ধ উৎপাদনের যে বর্ণনা আল কুরআনে দেওয়া হয়েছে, আধুনিক শরীর বিজ্ঞান আবিষ্কৃত তথ্যসমূহের সাথে তার আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়।

---

* আল কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের ইংরেজি অনুবাদ ডা. মরিস বুকাইলির (Dr. Maurice Bucaille) রচিত গ্রন্থ The Bible, The Quran and Science" থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

ভ্রূণতত্ত্ব

মানুষের সৃষ্টি জোঁক সদৃশ বস্তু থেকে

কয়েক বৎসর আগে আরবের কিছু ব্যক্তি আল কুরআন থেকে ভ্রূণনতত্ত্ব সম্পর্কিত সকল তথ্য সংগ্রহ করেন এবং এ ব্যাপারে আল কুরআনের এই নির্দেশ অনুসরণ করেন : "তোমরা যদি বুঝতে না পারো, তাহলে ঐশী বিষয়ে জ্ঞান আছে এমন লোক থেকে জেনে নাও।" *(আল কুরআন ১৬:৪৩ ও ২১:৭)*

আল কুরআন থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয় এবং তা কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ক অধ্যাপক এবং অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কিথ মুরের (Dr. Keith Moore) নিকট উপস্থাপন করে আল কুরআনে উল্লেখিত ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ক তথ্যাদি সম্পর্কে তার অভিমত জানতে চাওয়া হয়। উপস্থাপিত আয়াতসমূহ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে ডা. কিথ মুর (Dr. Keith Moore) বলেন, আল কুরআনে

উল্লেখিত ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত তথ্যাদির প্রায় সবগুলোই ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ে আবিষ্কৃত আধুনিক তথ্যসমূহের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেন অল্প কিছু আয়াতের সম্ভাব্য নির্ভুলত্ব সম্পর্কে তিনি কোনো অভিমত দিতে পারছেন না, কারণ ঐ তথ্যাদির বিষয়ে তার নিজেরই কিছু জানা নেই।

অবশ্য আল কুরআনে উল্লেখিত সব তথ্য ভ্রূণ তত্ত্বের উপর লেখা আধুনিক সন্দর্ভগুলো পাওয়া যায় না। আল কুরআনের আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

"অবহিত হও! তোমার প্রভু ও পালনকর্তার নামে, যিনি সামান্য এক জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।" *(আল কুরআন ৯৬:১-২)*

আরবি "আলাক" শব্দটি বলতে জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড ছাড়াও এমন কিছুকে বোঝায় যার আকৃতি জোঁকের মতো এবং যা জোঁকের মতো ঝুলে থাকে। ডা. কিথ মুর জানতেন না প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রূণকে জোঁকের মতো দেখায়। এই তথ্যটির যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য তিনি তার গবেষণাগারে অত্যন্ত শক্তিশালী অনুবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা চালান ও প্রাথমিক পর্যায়ের ভ্রূণের সাথে জোঁকের আকৃতির তুলনা করে দেখেন। ফলাফল তাঁকে বিস্মিত করে। তিনি দেখতে পান প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণ এবং জোঁকের আকৃতির মধ্যে রয়েছে অনস্বীকার্য সাদৃশ্য।

একইভাবে তিনি আল কুরআন থেকে ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ে আরো বহু তথ্য সম্পর্কে অবহিত হন, ইতিপূর্বে যা তাঁর জানা ছিল না। ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত আল কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা সম্পর্কে ডা. কিথ মুর প্রায় ৮০টি প্রশ্নের উত্তর দেন এবং উল্লেখ করেন আল কুরআন ও হাদিসের তথ্যসমূহের সাথে ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত সম্প্রতি আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। তিনি বলেন, এই সমস্ত প্রশ্ন যদি তাঁকে ত্রিশ বৎসর পূর্বে করা হতো তাহলে তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাবে প্রশ্নগুলোর অর্ধেকেরই জবাব দিতে পারতেন না।

ইতিপূর্ব ড. কিথ মুর "The Developing Human" নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আল কুরআন থেকে আহরিত নতুন জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ১৯৮২ সালে তিনি ঐ গ্রন্থের তৃতীয় সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। "The Developing Human" গ্রন্থটি কোন একক গ্রন্থকার রচিত সর্বোত্তম চিকিৎসা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হিসেবে অভিহিত হয় এবং পুরস্কারও অর্জন করেছে, "The Developing Human" পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই বইটি চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নরত প্রথম বার্ষিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তক হিসেবে মনোনীত ও পঠিত হচ্ছে।

১৯৮১ সালে সৌদি আরবের দাম্মামে অনুষ্ঠিত সপ্তম মেডিক্যাল সম্মেলনে ড. কিথ মুর তাঁর ভাষণে বলেন, "মানব শিশুর জন্ম সম্পর্কে আল কুরআনের বাণীসূহের ব্যাখ্যা প্রদানে সহযোগিতা করার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি সন্দেহাতীতভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, এই সমস্ত বাণী মুহাম্মদের (সাঃ) কাছে

নিশ্চিতভাবে স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক নাজিলকৃত। কারণ আল কুরআনে উল্লেখিত তথ্যাবলীর প্রায় সবগুলোই বহু শতাব্দী পরে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন। এই অবস্থায় আমার কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) অবশ্যই স্রষ্টা বা আল্লাহর প্রেরিত বার্তা বাহক ছিলেন।" যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন বেইলর কলেজ অব মেডিসিনের (Baylor College of Medicine) স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান ডা. জো লি সিম্পসন (Mr. Joe Leih Simpson) এক ভাষণে বলেন, "হাদীসে উল্লেখিত মুহাম্মদের (সাঃ) বাণীসমূহে উল্লেখিত তথ্যাদি তাঁর সময়ে বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচিত হতে পারে না। কারণ তখন ঐ সব তথ্য বিজ্ঞানীদের অজানা ছিল। উপরোক্ত বাণীসমূহ থেকে প্রমাণ হয় যে ভ্রূণতত্ত্ব ও ধর্মের (ইসলামে) মধ্যে শুধুমাত্র যে কোন দ্বন্দ্ব নেই, তাই নয়, বরং ধর্মই (ইসলাম) আল্লাহর নাজিলকৃত তথ্য দিয়ে প্রথাগত বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডকে সঠিকপথ দেখাতে পারে।" আল কুরআনে এমন অনেক ভাষ্য রয়েছে বহু শতাব্দী পরে যা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় আল কুরআন-বিধৃত জ্ঞান আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া।*

---

* This is Truth শীর্ষক ভিডিও টেপ থেকে উপরোক্ত তথ্য নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে ভিডিও টেপটির জন্য ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

মেরুদণ্ডের হাড় এবং পিঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী স্থান থেকে নির্গত এক বিন্দু তরলবস্তু থেকে মানুষের সৃষ্টি

"এখন মানুষ ভেবে দেখুক কী থেকে তার সৃষ্টি হয়েছে, তার সৃষ্টি মেরুদন্ড ও পিঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে উৎসারিত একবিন্দু পদার্থ থেকে।" *(আল কুরআন ৮৬:৫-৭)*

ভ্রূণ অবস্থায় মেরুদণ্ড এবং একাদশ ও দ্বাদশ পিঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী স্থানে পুরুষ ও স্ত্রী জনন অঙ্গগুলোর অর্থাৎ শুক্রাশয় ও ডিম্বকের বিক্রিয়া শুরু হয়। পরে ঐ বিক্রিয়ার নিম্নমুখী হয়ে ডিম্বানু নেমে আসে শ্রেণীতে এবং শুক্রাণু দেহ মধ্যস্থ তরল পদার্থবাহী নালী দিয়ে অণ্ডকোষে পৌঁছে। তাছাড়া প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রজনন অঙ্গ নীচে নেমে আসার পর এগুলো রক্ত ও অন্ত্র সম্পৃক্ত প্রয়োজনীয় সরবরাহ পায় তলপেটের রক্তবাহী ধমনী থেকে। তলপেটের এই ধমনীয় অবস্থিতি মেরুদণ্ড ও পিঞ্জরাস্থিত মধ্যবর্তী এলাকায় এমনকি লসিকা নালীর নি:সরণ এবং শিরাস্থ রক্তের প্রত্যাবর্তন ঐ একই এলাকা সম্পৃক্ত।

নুৎফাহ থেকে মানুষের সৃষ্টি

মহিমান্বিত গ্রন্থ আল কুরআনে কমপক্ষে এগার বার বলা হয়েছে মানুষের সৃষ্টি 'নুৎফাহ' থেকে। সামান্যতম তরল পদার্থে বা পানীয়ের একটি পাত্র শূন্য হওয়ার পর যে বিন্দু পরিমাণ তরল অবশিষ্ট থাকে- নুৎফাহ বলতে সেটাই বোঝানো হয়। আল কুআনের ২২:৫এবং ২৩:১৩সহ বহু সূরায় এর উল্লেখ রয়েছে।**

** কথাটি আল কুরআনের ১৬:৪, ১৮:৩৭, ৩৫:১১, ৩৬:৭৭, ৪০:৬৭, ৫৩:৪৬, ৭৫:৩৭, ৭৬:২ এবং ৮০:১৯ সূরা ও আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক তথ্যে জানা যায়, গড়ে ত্রিশ লক্ষ শুক্রাণুর মধ্যে ডিম্বককে পরাগিত করার জন্য একটিমাত্র শুক্রাণুর প্রয়োজন। এতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় স্বাভাবিকভাবে নির্গত শুক্রাণুসমূহের তিন লক্ষ ভাগের একভাগ শুক্রাণুই গর্ভসঞ্চারের কাজে লাগে।

সুলালাহ্ থেকে মানুষের সৃষ্টি

"অতঃপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে তার প্রজন্ম উৎপন্ন করেন" *(আল কুরআন ৩২:৮)*

আরবি শব্দ সুলালাহ্ দ্বারা কোন কিছুর সর্বোৎকৃষ্ট অংশ বোঝানো হয়। আমরা এখন জানতে পেরেছি পুরুষাঙ্গ থেকে বহির্গত লক্ষ লক্ষ শুক্রাণুর মধ্যে গর্ভসঞ্চারের জন্য ডিম্বকে প্রবিষ্ট একটিমাত্র শুক্রাণুই প্রয়োজন। লক্ষ লক্ষ শুক্রাণুকেই সুলালাহ্ বলা হয়েছে। এছাড়া সুলালাহ্ বলতে কোনো তরল বস্তু থেকে কোনো কিছু অত্যন্ত নমনীয়ভাবে সাথে আহরণকেও বোঝায়।

গর্ভসঞ্চার প্রক্রিয়ায় ডিম্বকোষ এবং শুক্রাণু উভয়ই তাদের অবস্থান থেকে অত্যন্ত নমনীয়তার সাথে আহরিত হয়।

নুৎফাতুন আমসাজ থেকে মানুষের সৃষ্টি

আল কুরআনের এই আয়াতটি লক্ষ্য করুন:

"যথার্থই আমরা একবিন্দু মিশ্রিত শুক্রাণু থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি।" *(আল কুরআন ৭৬:২)*

আরবি শব্দ 'নুৎফাতিন আমসাজিন' অর্থ মিশ্রিত তরল পদার্থ। আল কুরআনের কিছু তফসিরকারের মতে, মিশ্রিত তরল পদার্থ বলতে স্ত্রী বা পুংকোষ মিশ্রিত তরল পদার্থকে নির্দেশ করা হয়েছে। স্ত্রী ও পুংকোষের সংমিশ্রণের পরও জনন কোষ নুৎফাই-ই থেকে যায়। বিভিন্ন গ্রন্থি নিঃসৃত লালা থেকে সৃষ্ট শুক্রাণুসমৃদ্ধ রসকেও মিশ্রিত তরল হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্ত্রী ও পুংকোষ মিশ্রিত বিন্দু বা তরলকেই নুৎফাতিন আমসাজ রূপে অভিহিত করা হয়। উক্ত মিশ্রিত তরলবিন্দু পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে নিঃসৃত লালারই অংশ।

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্দিষ্ট হয় ডিম্বক নয়, শুক্রাণূর প্রকৃতি দ্বারা। ভ্রূণের লিঙ্গ স্ত্রী বা পুং, নির্দিষ্টকরণ নির্ভর করে ভ্রূণ কোষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম (Chromosome) যথাক্রমে x কিংবা xy কিনা তার উপর। গর্ভসঞ্চারের প্রথম পর্যায়ে ডিম্বকে প্রবিষ্ট শুক্রাণুর প্রকৃতির মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। যদি গর্ভ সঞ্চারকারী শুক্রাণু x প্রকৃতির হয় তবে ভ্রূণের লিঙ্গ হবে স্ত্রী জাতীয়। যদি y হয় তবে তা হবে পুরুষজাতীয়।

"তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী যুগ্মভাবে স্খলিত এক বিন্দু শুক্রাণু থেকে।" *(আল কুরআন ৫৩:৪৫-৪৬)*

আরবি শব্দ 'নুৎফাহ' অর্থ বিন্দু পরিমাণ তরল পদার্থ। 'তুমনা' অর্থ নির্গত বা স্খলিত। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই নুৎফাহ বলতে

বিশেষভাবে শুক্রকেই বোঝানো হয়েছে, কারণ শুক্র পুরুষাঙ্গ থেকে নির্গত হয়। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

"সে কি এক স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? পরে সে কি রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়নি? অতঃপর আল্লাহ্ আকৃতি দান করেননি? এবং তা থেকে সৃষ্টি করেননি নর ও নারী? *(আল কুরআন ৭৫: ৩৭-৩৯)*

এখানে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে পুরুষ থেকে নির্গত শুক্রের (নুৎফাতান মিনখাবিয়ান বাক্য দ্বারা যার ইঙ্গিত করা হয়েছে) একটি বিন্দুই ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে।

ভারতীয় উপমহাদেশে শাশুড়িরা সাধারণঃ পুরুষ সন্তান (এখানে নাতি) আশা করেন এবং পুরুষ সন্তান না হলে পুত্রবধূদের ধিক্কৃত করেন। কিন্তু ব্যাপারটা এরকম হতো না, যদি তারা জানতেন যে নারীর ডিম্বক নয়; পুরুষের শুক্রাণুর প্রকৃতিই সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। যদি দোষ কাউকে দিতেই হয় তাহলে তা দেওয়া উচিত তাদের পুত্রদের, পুত্র বধূদের নয়। কারণ আল কুরআন এবং বিজ্ঞান, উভয় ক্ষেত্রে উল্লেখিত হয়েছে পুং শুক্রাণু দ্বারাই নির্ধারিত হয়, শিশু স্ত্রীলিঙ্গের হবে না পুং লিঙ্গের।

ভ্রূণের প্রতিরক্ষায় রয়েছে তিনটি অন্ধকার আবরণ

"তিনি তোমাকে জননীর জঠরে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে, ঘিরে থাকা তিনটি অন্ধকার আবরণের অন্তরালে।"

অধ্যাপক কিথ মুরের মতে এই তিনটি আবরণ হচ্ছে :–

১. মায়ের তলপেটের অভ্যন্তরীণ আবরণ

২. জরায়ুর আবরণ বা দেয়াল

৩. ভ্রূণকে আবরিত করে রাখা ঝিল্লি

ভ্রূণ গঠনের বিভিন্ন পর্যায়

"আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান থেকে তৈরি করেছি, অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক নিরাপদ আধারে স্থাপন করি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পঞ্জরে। অস্থি পঞ্জরকে মাংস দ্বারা আবৃত করি, অবশেষে তাকে আরও এক প্রাণীর রূপদান করি। সুর্নিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান"! *(আল কুরআন ২৩:১২-১৪)*

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন, "মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে এক বিন্দু তরল পদার্থ থেকে, যা দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হয় একটি বিশ্রামস্থলে"। এটা স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্যই আয়াতে 'কারারিন মাকিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পিছনের মাংসপেশীর শক্ত অবস্থানের সাহায্য পুষ্ট পিঞ্জরাস্থির দৃঢ় আবরণে জরায়ু সুরক্ষিত থাকে। যে তরল রসপূর্ণ থলির অভ্যন্তরে ভ্রূণ বেড়ে ওঠে, সেই থলির আবরণই মূলতঃ ভ্রূণের প্রাথমিক সুরক্ষার কাজ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ভ্রূণের থাকে একটি সুরক্ষিত বাসস্থান। থলিস্থ ক্ষুদ্র পরিমাণ রস বা তরল পদার্থ "আলাক" এর রূপ নেয়। "আলাক" বলতে শক্তভাবে ঝুলে থাকে বা লেগে থাকে এমন কিছুকে বোঝানো হয়েছে।

"আলাক" অর্থে জোঁকের মতো পিচ্ছিল বোঝানো হয়। দুটো বর্ণনাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রূণ থলির ভেতরের দেয়ালের সাথে লেগে থাকে এবং অনেকটা জোঁকের মতো দেখায়। ভ্রূনের আবরণও জোঁকের (রক্তচোষা) মতোই। ভ্রূণ মায়ের কাছ থেকে গর্ভফুলের মাধ্যমে রক্ত গ্রহণ করে। "আলাক"-এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে জমাট রক্ত। আলাক পর্যায়ে (যা গর্ভসঞ্চারের তিন থেকে চার সপ্তাহ স্থায়ী) অবরুদ্ধ কোষের ভেতরে রক্ত জমাট বাঁধে। ঐ সময়েই ভ্রূণ জমাটবাধা রক্তের সাথে স্থির আকার ধারণ করে এবং অনেকটা জোঁকের মতো দেখায়। হ্যাম এবং লিউওয়েন হুক'ই (Ham & Leeuwen huek) প্রথম বৈজ্ঞানিক যারা ১৬৭৭ সালে সর্বপ্রথম মাইক্রোস্কোপ দিয়ে মানবিক বীর্যকোষ পর্যবেক্ষণ করেন। পূর্বে তাঁদের ধারণা ছিল বীর্যে থাকে অতি ক্ষুদ্রাকার (প্রায় অদৃশ্য) মানুষের আকৃতির কোষ যা জরায়ুর অভ্যন্তরে বাড়তে থাকে এবং জন্মকালীন শিশুতে পরিণত হয়। এই তত্ত্ব Perforation theory নামে পরিচিত। বিজ্ঞানীরা যখন আবিষ্কার করলেন শুক্রাণুর চেয়ে ডিম্বকের আকার বড়-ঐ সময় ডি-গ্রাফ (De Graph) এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী সিদ্ধান্তে আসেন যে, ডিম্বকের অভ্যন্ত রে খুব ছোট আকারে ভ্রূণের অবস্থান।

পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকে মৌপারটুইস (Maupertuis) প্রচার করেন তাঁর স্ত্রী ও পুং লিঙ্গ সমন্বিত উত্তরাধিকার তত্ত্ব। 'আলাক' রূপান্তরিত হয় 'মুদগাহ্-তে। 'মুদগাহ্' বলতে এমন কিছু বোঝায় যা চর্বিত হয়েছে (চর্বনকালীন দাঁতের চিহ্ন সমন্বিত) এবং আরো এমন

কিছু বোঝায় যা আঠালো, ক্ষুদ্র এবং চুইংগাম মুখে পুরে দেওয়ার মতো লাগে। দুটো বর্ণনাই বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ভুল। অধ্যাপক কিথ মুর ক্ষতে লাগানোর এক টুকরো plaster seal-কে ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়ের আকার ও আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দাঁতের ফাঁকে রেখে চর্বণ করে 'মুদগাহ্'-তে পরিণত করেন। অতঃপর তিনি চর্বিত 'মুদগাহ্' সদৃশ বস্তুটির সঙ্গে ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়ের ছবির সাথে তুলনা করে দেখেন দাঁতের দাগের চিহ্নের সাথে মেরুদণ্ডের প্রাথমিক গঠন পর্যায়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

মুদগাহ্ পরিবর্তিত হয় হাড়ে (izam) এবং হাড়ের সাথে সংযুক্ত হয় মাংস বা মাংসপেশী (lahm), অতঃপর আল্লাহ্ তাকে পরিণত করেন আর একটি মানবশিশুতে।

অধ্যাপক মার্শাল (Prof Marshal Johnson) সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম নেতৃস্থানীয় বৈজ্ঞানিক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার টমাস জেফারসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যানিয়েল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর এবং শরীর ব্যবচ্ছেদ বিভাগের চেয়ারম্যান। ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত আল কুরআনের ভাষ্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন-আল কুরআনে ভ্রূণ এবং ভ্রূণ সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ের যে ভাষ্য রয়েছে তা আকস্মিক সমাপতন বা সাযুজ্য হতে পারে না। তিনি আরো বলেন, সম্ভবত মুহাম্মদের (সাঃ) কাছে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল। যখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো আল কুরআন নাজিল হয় ১৪০০ বৎসর পূর্বে এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় মুহাম্মদের (সাঃ) সময়ের কয়েক শতাব্দী পরে;

তখন অধ্যাপক মার্শাল স্বীকার করেন যে, প্রথম আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র কোনো বস্তুকে দশগুণের বেশি বড় করে দেখাতে পারতো না। তাছাড়া সেই ছবিও স্পষ্টভাবে দেখা যেত না। উপসংহারে অধ্যাপক মার্শাল বলেন "মুহাম্মদ (সাঃ) আল কুরআন থেকে যে তথ্য সমূহের উল্লেখ করেছেন, তা ছিল মুহাম্মদের (সাঃ) কাছে আল্লাহ্ কর্তৃক নাজিলকৃত, এই ধারণাকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করার মতো কোনো কিছু তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।"

ড. কিথ মুরের অভিমত হচ্ছে ভ্রূণের বেড়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কিত যে তত্ত্ব বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী গৃহীত, তা খুব সহজে বোধগম্য নয়। সেজন্যই এই বেড়ে ওঠাকে বিভিন্ন পর্যায়ের চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন- পর্যায় ১, পর্যায় ২ ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ভ্রূণকে যে সমস্ত পর্যায় অতিক্রম করতে হয় আল কুরআনে সেগুলো নির্দিষ্ট এবং সহজবোধ্য করে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আল কুরআনের তথ্যাবলী জন্মপূর্বকাল পর্যন্ত ভ্রূণ সম্পর্কিত বিক্রিয়ার পর্যায়ভিত্তিক। এই সমস্ত বিবরণ সামগ্রিক এবং বাস্তবতার আলোকে প্রদত্ত।

আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহেও মানবসৃষ্টির ভ্রূণতাত্ত্বিক পর্য্যায়সমুহের উল্লেখ রয়েছে :

"সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? পরে সে কি রক্তপিণ্ডে পরিণত হয় নি? অতঃপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন এবং তা থেকে সৃষ্টি করেন নর ও নারী।" *(আল কুরআন ৭৫:৩৭-৩৯)*

এবং, "তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দিয়েছেন এবং সুষম করেছেন, তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।" *(আল কুরআন ৮২:৭-৮)*

ভ্রূণ : আংশিক গঠিত এবং আংশিক অগঠিত

'মুগদাহ' পর্যায়ে যদি ভ্রূণকে কেটে উন্মুক্ত করা যায় এবং ভেতরের কোষগুলো পরস্পর থেকে পৃথক করা হয় তাহলে দেখা যাবে বেশির ভাগ কোষ গঠিত হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলো সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়নি। অর্থাৎ অগঠিত রয়ে গেছে।

অধ্যাপক জনসন (Prof. Johnson) বলেন, যদি আমরা ভ্রূণকে সম্পূর্ণরূপে গঠিত বলি তবে আমাদের বক্তব্য হবে ভ্রূণের ঐ অংশ সম্পর্কে যা ইতোমধ্যে গঠিত হয়েছে। আবার আমরা যদি ভ্রূণকে অগঠিত বলি, সেই বক্তব্য হবে ভ্রূণের যে অংশের গঠন এখনো অসম্পূর্ণ সেই অংশ সম্পর্কিত। কাজেই প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি একটি সম্পূর্ণ নির্মাণ? না অসম্পূর্ণ নির্মাণ ? ভ্রূণ গঠন সম্পর্কিত এই পর্যায়সমূহের যে বর্ণনা আল কুরআনে দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে সঠিক বর্ণনা আর কোথাও নেই। "আংশিক গঠিত এবং আংশিক অগঠিত" বিষয়টি এভাবে আল কুরআনে এসেছে :-

"আমরা তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র থেকে, তারপর জোঁকের মতো রক্তপিণ্ড থেকে, অতঃপর আংশিক গঠিত এবং আংশিক অগঠিত মাংসপিণ্ড থেকে।" *(আল কুরআন ২২ : ৫)*

বৈজ্ঞানিক সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি ভ্রূণের বেড়ে ওঠার এই প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু কিছু কোষকে পৃথক করা হয়েছে এবং কিছু

কিছু কোষকে পৃথক করা হয়নি- অর্থাৎ কিছু কিছু কোষ গঠিত হয়েছে এবং কতকগুলো গঠিত হয়নি।

শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি

মানবিক ভ্রূণের যে অনুভূতিটি আগে জন্মায় তা হচ্ছে শ্রবণ শক্তি। ভ্রূণ উদ্ভবের ২৪ সপ্তাহ পরেই শব্দ শুনতে পায়। ২৮ সপ্তাহের মধ্যে দৃষ্টির অনুভূতি জাগে এবং চোখের মনি আলোকচ্ছটা স্পর্শক হয়ে ওঠে।

ভ্রূণের বিভিন্ন অনুভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠা সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে :

"এবং তিনি তোমাকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টি এবং অনুভূতি।" *(আল কুরআন ৩২:৯)*

এবং "বাস্তবিকই আমরা একবিন্দু মিশ্রিত শুক্রাণু থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের পরীক্ষা (বা যাচাই) করার জন্য দিয়েছি (উপহার) শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি।" *(আল কুরআন ৭৬:২)*

অন্যত্র : "তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণ, দৃষ্টি, অনুভূতি এবং উপলব্ধির শক্তি, যার জন্য তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" *(আল কুরআন ২৩:৭৮)*

সবগুলো আয়াতেই দৃষ্টি শক্তির পূর্বে শ্রবণ শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের আবিষ্কারের সাথে আল কুরআনের বর্ণনার হুবহু মিল রয়েছে।

সাধারণ বিজ্ঞান

আঙ্গুলের ছাপ

"মানুষ কি মনে করে যে, আমরা অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারব না? বস্তুত: আমরা মানুষের আঙ্গুলের ডগাগুলো পর্যন্ত যথাযথভাবে পুনঃবিন্যস্ত করতে সক্ষম।" *(আল কুরআন ৭৫:৩-৪)*

পুনরুত্থান (Resurrection) সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা প্রশ্ন তোলে মৃত্যুর পর যে মানুষের হাড় পর্যন্ত মাটিতে মিশে যায় তাদের পুনরুত্থান কিভাবে সম্ভব? এবং বিচার দিনে (Day of judgement) অযুতকোটি মানুষকে কিভাবেই বা আলাদা করে চেনা যাবে?

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উত্তর হচ্ছে তিনি যে শুধুমাত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া হাড়গুলোকে জোড়া লাগাতে পারেন তাই নয়, নিখুঁতভাবে আমাদের আঙ্গুলের ডগাগুলোকে জোড়া লাগাতে পারেন তাই নয়, নিখুঁতভাবে আমাদের আঙ্গুলের ডগাগুলোকেও পুনঃসৃষ্টি করতে পারেন।

পুনরুত্থানের পরে প্রতিটি মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে শনাক্তকরণের বিষয়ে বলতে আল কুরআনে বিশেষভাবে আঙ্গুলের ডগার কথা কেন উল্লেখ করা হয়েছে। স্যার ফ্রান্সিস গোল্টের (Sir Francis golt) গবেষণার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৮০ সাল থেকে আঙ্গুলের ছাপ সনাক্তকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। পৃথিবীতে কোনো দুই ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ অবিকল এক রকম হতে পারে না। এ কারণেই বিশ্বব্যাপী পুলিশ অপরাধী শনাক্ত করতে আঙ্গুলের ছাপকে ব্যবহার করে। ১৪০০ বৎসর পূর্বে প্রতিটি মানুষের আঙ্গুলের ছাপের বিভিন্নতা সম্পর্কে কার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল? নিশ্চিতভাবে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নয়!

ত্বকে বেদনা অনুভূতি-গ্রাহক কোষের উপস্থিতি

আগে ধারণা করা হতো সকল অনুভূতি ও বেদনাবোধ শুধুমাত্র মগজের উপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক আবিষ্কারে প্রমাণিত হয়েছে ত্বকেই রয়েছে বেদনাগ্রাহক কোষ। ত্বকস্থিত গ্রাহক কোষ ব্যতীত কেউ ব্যথা অনুভব করতে পারবে না। কোনো চিকিৎসক যখন অগ্নিদগ্ধ কোনো রোগীকে পরীক্ষা করেন তখন তিনি অগ্নিদগ্ধতার গভীরতা মাপতে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ অথবা অন্যকোন লৌহশলাকা ক্ষতস্থানে প্রবিষ্ট করেন। রোগী ব্যথা অনুভব করলে চিকিৎসক খুশি হন। কারণ এতে বোঝা যায় পুড়েছে শুধু উপরিভাগ এবং ত্বকস্থিত বেদনাগ্রাহক কোষ অক্ষত রয়েছে। অন্য দিকে রোগী যদি ব্যথা অনুভব না করে তখন চিকিৎসক বোঝেন ক্ষত অনেক গভীর হয়েছে

এবং বেদনাগ্রাহক কোষ ধ্বংস হয়ে গেছে। বেদনাগ্রাহক কোষের অস্তিত্ব সম্পর্কে আল কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে :-

"যারা আমাদের আয়াতকে অস্বীকার করে আমরা তাদের শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করব। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই তদস্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(আল কুরআন ৪:৫৬)*

থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীর ব্যবচ্ছেদ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাগাতাত তেজাসেন (Prof. Tagatat Tejasen) দীর্ঘদিন বেদনাগ্রাহক কোষ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। প্রথম দিকে তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি, ১৪০০ বৎসর পূর্বেই আল কুরআনে বেদনাগ্রাহক কোষের উল্লেখ করা হয়েছে। পরে তিনি উক্ত আয়াতের ইংরেজি অনুবাদ বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখেন। অধ্যাপক তেজাসেন আল কুরআন ও হাদিসের বিজ্ঞানসম্মত বাণী পাঠ করে এতই মুগ্ধ হন যে, রিয়াদে অনুষ্ঠিত ৮ম সৌদি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্মেলনে সর্বজন সমক্ষে ঘোষণা করেন ঃ আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই। মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বাণী বাহক। (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্)।

উপসংহার

আল কুরআনে উল্লেখিত বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহকে আকস্মিক সামঞ্জস্য (Coincidence) বলে অভিহিত করা নিতান্তই সাধারণ জ্ঞান (Commonsense) ও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী। আল কুরআনে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে চিন্তা করে দেখার জন্য মানব সমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে :-

"অবহিত হও নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে রয়েছে প্রজ্ঞাবানদের জন্য নিদর্শন।" *(আল কুরআন ৩:১৯০)*

আল কুরআনে বিধৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিই প্রমাণ করে নিশ্চিতভাবে এই মহাগ্রন্থ একটি ঐশী কিতাব। ১৪০০ বৎসর পূর্বে এমন একটি গ্রন্থ প্রণয়ন কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, যাতে রয়েছে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য, যা ঐ সময়ের বহু শতাব্দী পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে কুরআন কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়,

এটি সংকেতপূর্ণ বা ইশারাপুর্ণ একটি গ্রন্থ। এই সমস্ত ইশারা মানুষকে আহ্বান জানায় পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা এবং প্রকৃতিবান্ধব পরিবেশে বাস করার। আল কুরআন সত্যিকারভাবেই মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্র একত্বের সেই একই বাণী যা হযরত আদম থেকে শুরু করে হযরত মুসা, হযরত ঈসা (যীশুখৃষ্ট) এবং হযরত মুহাম্মদ (তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) পর্যন্ত সকল নবীই প্রচার করে গেছেন।

আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য সম্পর্কে বহু বড় বড় গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং আরো উন্নত গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ! এই সমস্ত গবেষণা মানব সমাজকে আল্লাহর বাণীর অধিকতর নিকটবর্তী হতে সাহায্য করবে। এই পুস্তিকায় আল কুরআনে উল্লেখিত মাত্র অল্পকিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, এর স্বল্প পরিসরে বক্ষমান বিষয়ের উপর যথাযথ সুবিচার করতে পেরেছি এমন দাবি আমার নেই।

অধ্যাপক তেজাসেন (Prof. Tejasen) আল কুরআনে উল্লেখিত বৈজ্ঞানিক সংকেতসমূহের শুধুমাত্র একটির উপলব্ধির আলোকে ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো কারো জন্য হয়ত দশটি সংকেতের প্রয়োজন হবে, আবার অন্য কিছু লোকের জন্য আল কুরআনের ঐশী উৎসের উপর ঈমান আনার জন্য লাগবে একশত সংকেত। কেউ হয়তো এক হাজার সংকেত দেখানোর পরও ঐ সত্যকে গ্রহণে অনীহা দেখাবে। আল কুরআনে শেষোক্ত লোকদের নিন্দা করা হয়েছে এরূপভাবে ঃ

“তারা বধির, বোবা এবং অন্ধ, সুতরাং তারা ফিরে আসবে না (সত্যের পথে)” *(আল কুরআন ২:১৮)*

আল কুরআনে রয়েছে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (Complete code of life)। আলহামদুলিল্লাহ! আল কুরআন নির্দেশিত জীবনাচরণ আধুনিক মানুষের অজ্ঞতাপ্রসূত আবিষ্কৃত ‘তন্ত্রের’ (Islams) চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। মহান স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে উত্তম পথ নির্দেশ দানের জন্য?

আমার এ দীন প্রচেষ্টা যেন আল্লাহ্ কবুল করেন, তাঁর মহান দরবারে এই আমার মুনাজাত। আমি তাঁর করুণা এবং তাঁর কাছ থেকে পথের দিশার ভিখারি! (আমিন!)

ডা. জাকির নায়েক

ডা. জাকির নায়েক সমকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের এক বিশ্রুতনামা ইসলামী পণ্ডিত ও বাগ্মী। বহু ধর্মের মূল গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে অসাধারণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের রয়েছে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতা। ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার প্রচার প্রসারে তাঁর অবদান অসামান্য।

ডা. জাকির নায়েক রচিত বহু গ্রন্থ মানবসমাজের জন্য মূল্যবান দলিল হিসেবে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

ডিজাইন : মো. আব্দুল লতিফ

খোন্দকার হাবীবুর রহমান এক বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী। তিনি একাধারে সাতিহ্যিক, সাংবাদিক, কবি, প্রশাসক, ব্যাংকার, বীমাবিদ এবং অনুবাদক। তাঁর অনূদিত কয়েকটি গ্রন্থ 'ইসলাম ঃ প্রথম ও চূড়ান্ত ধর্ম', 'আল্লাহ্‌র গজবে ধ্বংস হলো যারা', 'মুক্তিনায়ক আইজেন হাওয়ার' প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এছাড়া বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে কবি শিহাম আল মুজাহিদী'র সঙ্গে যৌথভাবে অনূদিত 'Islamic Concept of God' শিগ্‌গিরই প্রকাশিত হচ্ছে।

ডা. জাকির নায়েক শ্রুতকৃতি এক মনীষী ও বাগ্মীপ্রবর-
শুধু আমাদের এই উপমহাদেশ নয়-এশিয়ার এক মহতী সন্তান তিনি।
জগৎ জুড়ে বহু-উচ্চারিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর স্মৃতিপ্রখরতা নিঃসন্দেহে
অনন্যপূর্ব। আলোচ্যগ্রন্থ 'কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান' একদিন
মানবজাতির স্মৃতির অভিলেখাগারে সুসংরক্ষিত থাকবে।
কেবলমাত্র মুসলিম জাতির জন্যই নয়, আন্তর্জাতিক মানবসম্প্রদায়ের
চেতনা, জীবন ও জগৎকে করে তুলবে ক্রমপ্রসরমান।
তাঁর মনীষার মহান দ্যুতি- মানুষের আত্মার প্রসারণে ঘটাবে
নবতরজাগরণ। মানবিকতা ও মানবীয়তার মহাদিগন্তকে করবে সুবিস্তীর্ণ
এবং অতি সম্প্রসারিত....

আল মুজাহিদী

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম